আফ্রিকার ছোটগল্প : উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ, দাসব্যবসা ও আফ্রিকী জীবন

জাবেদ ইকবাল*

[সারসংক্ষেপ : আফ্রিকী জীবন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ ও সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও প্রকাশক হিসেবে আফ্রিকার ছোটগল্পগুলো অনন্য। গল্পগুলোতে রূপায়িত হয়েছে উপনিবেশবাদ, দাসব্যবসা, বর্ণবাদ ও আফ্রিকী জীবনের সার্বিক চিত্র। গল্পগুলো আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিকদের দ্বারা রচিত হলেও এর মূলভাব এক ও অভিন্ন, আর তা হলো আফ্রিকী সত্তার রূপায়ণ। গল্পগুলোতে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের লেখকগণ কখনো প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনো প্রচ্ছন্নভাবে রূপক-প্রতীকের আবরণে রূপায়ণ করেছেন ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ, অত্যাচার, বঞ্চনা ও বঞ্চনার উপলব্ধি, দাসব্যবসা, বর্ণবাদ ও শ্রেণিবিভক্ত সমাজের নিপুণচিত্র। তবে শুধু এগুলোর রূপায়ণ করেই তাঁরা থেমে যাননি, বরং প্রকাশ করেছেন বঞ্চনার অবসান প্রকাশক এক অপরিমেয় আশার বাণী ও সোনালি সুদিনের আগমনের প্রত্যাশা, যেখানে প্রকাশিত হয়েছে একটি সুন্দরজীবন, স্বাধীনদেশ এবং মানুষ হিসেবে মৌলিক চাহিদা ও অধিকারগুলো পূরণ করে বেঁচে থাকার জন্য আকাঙ্ক্ষা।]

পৃথিবীর সাতটি মহাদেশের অন্যতম একটি আফ্রিকা। পাশ্চাত্যের পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে লেখা ইতিহাসে যাকে অভিহিত করা হয়েছে 'বন-জঙ্গলে ভরা পৃথিবীর উন্মুক্ত চিড়িয়াখানা' কিংবা 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ' হিসেবে। কিন্তু নিরপেক্ষ মূল্যায়নে আফ্রিকা কোনোভাবেই 'পৃথিবীর উন্মুক্ত চিড়িয়াখানা' বা 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ' নয়, বরং মানবসভ্যতার সূতিকাগার; যে সৃষ্টির প্রথম প্রহরে সমুদ্রের বুক থেকে জেগে উঠেছিল, লালন করেছিল মানবকে ও তার সভ্যতাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়,

উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথা-নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা –
বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়
কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।
সেখানে নিভৃত অবকাশে তুমি
সংগ্রহ করছিলে দুর্গমের রহস্য,
চিনছিলে জলস্থল-আকাশের দুর্বোধ সংকেত,
প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত জাদু
মন্ত্র জাগাচ্ছিল তোমার চেতনাতীত মনে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬৭ : ৪৯)

* প্রভাষক, রবীন্দ্র অধ্যয়ন বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

অরুণ বসু বলেছেন, "পৃথিবীতে মানববর্গ আবির্ভাবের একমাত্র অথবা অন্যতম প্রধান কেন্দ্রভূমি ছিল আফ্রিকা মহাদেশের কোন একটি বা কতিপয় দেশ" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৬৯)। বস্তুত আফ্রিকা সম্পর্কে এই নিকৃষ্টতম প্রচারটা করেছে পাশ্চাত্যের শ্বেতাঙ্গ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিগণ। তাঁরা আফ্রিকাকে অভিহিত করেছে 'বন-জঙ্গলে ভরা পৃথিবীর উন্মুক্ত চিড়িয়াখানা' কিংবা 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ' হিসেবে। তাঁরা আফ্রিকাকে গণ্য করেছিল একটি পাড়া বা মহল্লা হিসেবে। আফ্রিকাকে তাঁরা কখনোই বিবেচনা করেনি অনেকগুলো দেশ ও জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল ও মহাদেশ রূপে। তাঁরা কখনোই বলেনি যে, এই জনগোষ্ঠীগগুলোর আচার-ব্যবহার, রীতি, নীতি, অভ্যাস, সংস্কার কখনোই একই রকম নয়। আফ্রিকার বনজ, খনিজ ও জীব সম্পদ যে বিচিত্র রকম, বহুরূপী, বহুভিন্ন, বহুপ্রকার এবং তাদের একেক দেশের ঠিকানা ও বিবর্তন যে নানাভাবে হয়েছিল– এসব কথা তাঁরা এড়িয়ে গিয়েছিল কিংবা ভুলে থাকতে চেয়েছিল। তা না হলে তাঁরা বুঝতে পারত যে, গ্রিক ও লাতিনের পর ইউরোপের অনেক দেশেই যখন নিজস্ব কোনো লিখিত ভাষারূপ উদ্ভাসিত হয়নি, তারও অনেক আগেই আফ্রিকার কিছু কিছু দেশে লিখনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাদের ঐতিহ্য, পরম্পরা, অভ্যাসও সবসময় ঠিক একই রকম ছিল না। এরা কখনো বিবেচনাই আনতে চায় না যে, মিশরও আফ্রিকার একটি দেশ, আর এই মিশরের গুহাচিত্রেই লিপির প্রথম নিদর্শন পেয়েছে মানুষ। মিশরের মতো সুদানেও এমনকি সাহারা মরুভূমির ওপরের বা নিচের দেশসমূহের প্রাকৃতিক দৃশ্য, জীবনযাত্রার ধরন, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার ও জীবনের ছন্দ ছিল অন্যরকম। সেখানে কখনো একই দেশে গড়ে উঠেছিল বহুভাষা, বহুমত, বহুপরিধান।

আমরা যদি উন্মুক্তদৃষ্টি দিয়ে আফ্রিকার ভূমির দিকে লক্ষ করি, তাহলে দেখব যে, আফ্রিকার মোট ভূমির মাত্র ৫ শতাংশ জঙ্গল, আর আফ্রিকার সভ্যতা, বিশেষত নীল নদের অববাহিকায় গড়ে ওঠা সভ্যতা গ্রিক সভ্যতার চেয়ে কোনো অংশে কম ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন নয়। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের লেখকেরা কলোনাইজারদের তৈরি কল্পিত আখ্যানকে ভেঙে দিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে উপনিবেশিত ও প্রাক-ঔপনিবেশিক সময়ের চিত্রের তুলনামূলক রূপায়ণের মধ্য দিয়ে, ঔপনিবেশিক ইতিহাসবিদদের তৈরি মিথ্যাচারের স্বরূপ উন্মোচন করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ইউরোপীয়দের আগমনপূর্ব আফ্রিকার অতীত কোনোভাবেই অসভ্যতা ও বন্যতায় ভরা কোনো দীর্ঘরজনী ছিল না। এজন্য বিষ্ণু বসু মন্তব্য করেছেন, "আফ্রিকাকে 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ' বলে অভিহিত করা মানে মূলত আমাদের 'শিক্ষিত মানসিকতা'কে আরো বেশি অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাওয়া" (বিষ্ণু, ২০০৫ : ২৫)।

দুই

আফ্রিকার ছোটগল্প বলতে আমরা, যে বিশাল-বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্ন লেখকের লেখা গল্পকে নির্দেশ করতে চাচ্ছি, সেই ভূ-খণ্ডটি হলো পৃথিবীর মানচিত্রের অন্যতম একটি মহাদেশ আফ্রিকা। "জল আর ডাঙ্গার লক্ষ লক্ষ বছরের ভাঙ্গাগড়ার খেলায় পৃথিবীর স্থলভাগের মধ্যে আফ্রিকা শক্ত মাটির দেশ" (শাহেদ, ২০১২ : ১১)। যেখানে লক্ষ লক্ষ বছর আগে মানুষ ও মানবসভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল; যার আয়তন এক কোটি ষোলো লক্ষ পঁচাশি হাজার বর্গমাইল; দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ৫২০০ মাইল, প্রস্থ পূর্ব-পশ্চিমে ৪৬০০ মাইল; যার উত্তরে রয়েছে ভূমধ্যসাগর, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণ পাশে ভারত মহাসাগর,

পূর্বে ভারত মহাসাগর, আরব মহাসাগর, লোহিত সাগর; যার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে বিষুব রেখা, উত্তরাংশে সাহারা মরুভূমি, সেখান দিয়ে গেছে কর্কটক্রান্তি রেখা, দক্ষিণাংশে কালাহারি মরুভূমি, সেখান দিয়ে গেছে মকরক্রান্তি রেখা। এই ভূ-খণ্ডের উত্তর-পূর্বে আরব উপদ্বীপ, দক্ষিণ-পূর্বে মাদাগাস্কার দ্বীপ। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের বিচিত্র ভূগোল ও পরিবেশের মধ্যে ৫০টি দেশে ৭৫টি নৃগোষ্ঠীর প্রায় ১০০ কোটি মানুষ বাস করে; আঞ্চলিক সংস্কৃতির ভিত্তিতে যাদেরকে প্রায় ৭৫টি আদিবাসীর ভূমিতে ভাগ করা যায়। ভূগোলে আফ্রিকার অবস্থান মোটামুটি নির্দিষ্ট হলেও মিশর ও ইথিওপিয়া বাদে এই বিরাট মহাদেশ মানবসভ্যতার ইতিহাসে এখনো পর্যন্ত তার যথাযোগ্য পরিচয় লাভ করে নি। আফ্রিকার অধিবাসীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজ-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, ধর্ম, শিল্পকলা, চিত্তসম্পদ নিয়ে ঐ মহাদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশের অধ্যবসায়ী সাহিত্যিকেরা রচনা করেছেন অনন্যসাধারণ কবিতা, ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাসসহ বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম যেখানে প্রতিফলিত হয়েছে আফ্রিকী জীবন-জীবিকা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি-মূল্যবোধ, ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের তীব্র যন্ত্রণা, দাসব্যবসা ও বর্ণবাদের চিত্র তথা আফ্রিকার সার্বিক জীবন। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের কথাসাহিত্যিকদের রচিত ছোটগল্পে কীভাবে উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ, দাসব্যবসা ও আফ্রিকী জীবনের রূপায়ণ ঘটেছে তারই অন্বেষণ করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে। আকরগ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে শিবনারায়ণ রায় ও শামীম রেজা সম্পাদিত *আফ্রিকার সাহিত্য সংগ্রহ* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডকে।

তিন

আফ্রিকার সাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রে প্রধান একটি সমস্যা হলো ভাষা। ভাষাতাত্ত্বিকদের বরাত দিয়ে আফ্রিকার সাহিত্য আলোচক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ জানিয়েছেন, বর্তমানে–

> আফ্রিকায় ভাষা রয়েছে ৭৩০টির বেশি। এগুলোকে তারা আবার চারটি ভাষা দলে বিভক্ত করেছে– ১. কংগো করদোফীয়, ২. নিল সাহারীয়, ৩. আফ্রো এশীয়, ৪. খইসান। কংগো করদোফীয় মূলত বানটু ভাষা থেকে উদ্ভূত ভাষাগোষ্ঠী... এ গোষ্ঠীর ভাষা সংখ্যা ৪৫০-এর বেশি– শুধু তানযানিয়া অঞ্চলেই রয়েছে এ ভাষার ৮০টির বেশি রূপ। নিল সাহারীয় গোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহার হয় নিল নদী, নাইজার নদী ও সুদান অঞ্চলে। খইসান আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের ভাষা (শাহেদ, ২০১২ : ২৫)।

–এটা আফ্রিকার নিজস্ব ভাষাগুলোর চিত্র। উপনিবেশ পরবর্তী আফ্রিকার দিকে তাকালে আমরা দেখব যে, আফ্রিকার নিজস্ব ভাষাগুলোর পাশাপাশি সেখানে ঔপনিবেশিক প্রভুদের ভাষা ব্যবহারের একটা সক্রিয় প্রবণতা বিরাজমান। এই প্রবণতা ক্ষেত্র বিশেষে এতটাই প্রবল যে, কলোনাইজারদের ভাষা আফ্রিকার নিজস্ব ভাষাকে হটিয়ে সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে। এই প্রবণতা শুরু হয়েছিল মোটামুটি সপ্তম শতকে। তখন থেকেই আফ্রিকার উত্তর অংশে আরব সংস্কৃতির প্রভাব ও প্রসার বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে ঐ সময় থেকেই উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে আরবি ভাষা শিক্ষিত ও অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের মূল ভাষায় পরিণত হয়। আঠারো শতক পরবর্তীকালে যখন ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো আফ্রিকাকে গ্রাস করে নিতে থাকে তখন ইংরেজি, ফরাসি, পর্তুগিজ ও ওলন্দাজ ভাষা প্রসার লাভ করে আফ্রিকায়; এমনকি আফ্রিকার কোনো কোনো দেশে ইংরেজি ও ওলন্দাজ ভাষার উপভাষাও তৈরি হয়। এর ফলে দেখা যায় যে, উপনিবেশ পরবর্তী আফ্রিকার বর্তমান সমাজে শিক্ষিত ও অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই মোটামুটি দুইটি বা তিনটি ভাষায় পারদর্শী– ক. ইংরেজি বা ফরাসির সঙ্গে আরবি

খ. ইংরেজি বা ফরাসির সাথে পর্তুগিজ বা ওলন্দাজ। এর পাশাপাশি প্রায় সবাই তাদের স্ব-স্ব গোষ্ঠীর ভাষায় কথা বলতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে এই ভাষা দুটি বা তিনটি নৃগোষ্ঠীর ভাষাও হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতাটা হলো দৈনন্দিন, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় জীবনে ইংরেজি, ফরাসি, পর্তুগিজ ও ওলন্দাজ ভাষার এত ব্যবহার সত্ত্বেও আফ্রিকার সাধারণ মানুষ এসব ইউরোপীয় ভাষায় অজ্ঞই রয়ে গেছে। আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক শাসনের দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখবো যে, দীর্ঘকাল ধরে আফ্রিকাকে শাসন করেছে আরব, ইংরেজ, ফরাসি ও পর্তুগিজরা। এই ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর ভাষাই কার্যত হয়ে উঠেছে আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকার মানভাষা। এই ভাষাগুলোতেই মূলত লিখিত হয়েছে কিংবা হচ্ছে আফ্রিকার সাহিত্য। একারণে আমরা দেখবো, ঔপনিবেশিকতার সূত্রেই পশ্চিম এশীয় আরবি ভাষার সাহিত্যের এক বিশাল ভান্ডার ছড়িয়ে রয়েছে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা জুড়ে। তবে ভাবের দিক থেকে উত্তর আফ্রিকার আরবি সাহিত্য বিশেষত মিশর ও লিবিয়ার সাহিত্য আফ্রিকার সাহিত্যের মূল ধারার সঙ্গে সমান্তরাল নয়। মিশরের সাহিত্য স্বকীয়তা ও বিশিষ্টতা নিয়ে বিশ্বসাহিত্যে সমাদৃত। এরই সমান্তরালে আফ্রিকার বিভিন্ন আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষাতেও সাহিত্য রচিত হয়েছে কিংবা হচ্ছে। তবে আফ্রিকার বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষাতে সাহিত্য যে কম রচিত হয়েছে বা হচ্ছে না তার কারণ, আফ্রিকার অনেকগুলো নৃ-গোষ্ঠীর ভাষার নিজস্ব লিপি নেই এবং ভাষীর ও উত্তরাধিকারীর অভাবে বেশ কিছু ভাষা বিলুপ্তির আশঙ্কার মধ্যে রয়েছে। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,

> দাস ব্যবসার যখন সূচনা হচ্ছিল তখন আফ্রিকাবাসীরা ছিলো 'কাঠ, পেতল আর লোহার কাজে ওস্তাদ শিল্পী, তারা ধাতু গলিয়ে নিয়ে নিত্য সব শিল্পসামগ্রী তৈরি করতে শিখেছিল শ্বেতাঙ্গরা আফ্রিকায় পা দেবার অনেক আগেই, আর তাদের অনেক গোষ্ঠীরই ছিলো উদ্‌ঘাতমুক্ত অতীব উন্নত ধর্মাচার, সুষ্ঠু সমুন্নত অর্থনৈতিক রীতিনীতি, সুদক্ষ কৃষিব্যবস্থা ও কৃষিচর্চা, প্রশংসনীয় আইনি ব্যবস্থা ও তার বিধিবিধানসংহিতা... ভাস্কর্য, লোকসাহিত্য আর সংগীত ... কিন্তু তারা উদ্ভাবন করেনি বহুল প্রচারিত লিখিত ভাষা। (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ১৭৬)

কবি বেলাল চৌধুরীর মতে, "কৃষ্ণ আফ্রিকার যা কিছু অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, সামাজিক রীতিনীতি সবই চলে আসছিল মুখে মুখে রচিত গাথায়, শ্লোক, কিংবদন্তির মারফত লোকমুখে বংশানুক্রমে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ১৬৪)। এমতাবস্থায় যে বড় একটা প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায় তা হলো : আফ্রিকার লেখকেরা কোন ভাষায় সাহিত্য রচনা করবে? এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আফ্রিকার শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যিকদের মধ্যেই মতভেদ রয়েছে। কেনিয়ার কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার ও চিন্তাবিদ নগুগি ওয়া থিওঙ্গ (Ngugi wa Thiong'O, 1938–)-এর মতো অনেকেই মনে করেন, "আফ্রিকার সাহিত্য হতে হবে আফ্রিকার ভাষাতেই; কেননা একটা সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি অন্য ভাষায় বর্ণনায় অনেক সময় প্রাণহীন ও অবাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে" (শাহেদ, ২০১২ : ২৬)। তিনি পশ্চিমাদের ভাষায় আফ্রিকার সাহিত্য রচনাকে উদ্ভট বলে মনে করেন। তাঁর দৃষ্টিতে এগুলো হলো "আফ্রিকাকে অন্তহীন দাসত্বে আটকে রাখার সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা" (শাহেদ, ২০১২ : ২৬)। তাঁর মতো আফ্রিকার অনেক সাহিত্যিকই মনে করেন, "আফ্রিকার বিশিষ্ট নান্দনিক উত্তরাধিকার অন্য ভাষায় প্রকাশ করলে তা হবে বহিরারোপিত এবং আফ্রিকার সাহিত্যের বিকশিত হওয়ার পথে তা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে" (শাহেদ, ২০১২ : ২৬)। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নাইজেরীয় নাট্যকার ওলে সোয়িঙ্কা (Wole Soyinka, 1934–) এরূপ

মতবাদের বিরোধী। তিনি মনে করেন, দৈনন্দিন জীবন থেকে সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রিক জীবনে আমরা যেখানে প্রতি মুহূর্তে পাশ্চাত্য দ্বারা প্রভাবিত, সেখানে পাশ্চাত্য প্রভাবকে বাদ দিয়ে সাহিত্য রচনার প্রয়াস 'উদ্ভট', কারণ পারিপার্শ্বিক পাশ্চাত্য প্রভাবকে ব্যক্তির মন থেকে দূর করা নম্ভব নয়। বুকার পুরস্কার বিজয়ী নাইজেরীয় কথাসাহিত্যিক চিনুয়া আচেবে (Chinua Achebe, 1930–2013) অবশ্য এক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী। তিনি মনে করেন, আফ্রিকার সাহিত্য পাশ্চাত্যের ভাষাতেও রচিত হতে পারে আবার আফ্রিকার নিজস্ব দেশীয় ভাষাতেও রচিত হতে পারে।

এমন পরিস্থিতিতে আফ্রিকার সাহিত্যিকগণ কিছু পন্থা অবলম্বন করেছেন। যেসব আফ্রিকান সাহিত্যিক পাশ্চাত্যের ভাষা ও রীতিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন তাঁরা প্রথমে তাঁদের সাহিত্য ঐ ভাষাতেই লিখছেন এবং পরবর্তীকালে স্বগোত্র বা স্বদেশী ভাষায় তা ভাষান্তর করছেন। আবার যাঁরা কলোনাইজারদের ভাষায় আফ্রিকার সাহিত্য রচনার তীব্র বিরোধী তাঁরা প্রথমে স্বগোত্র বা স্বদেশি ভাষায় সাহিত্য রচনা করছেন এবং পরবর্তীকালে তা পশ্চিমা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করছেন। আফ্রিকার সাহিত্যিকগণ এটা উপলব্ধি করেছেন যে, বাস্তবিক অর্থে কলোনাইজারদের ভাষা যেহেতু বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত তাই তাদের প্রতি বিরাগ কিংবা ঘৃণা থাকলেও সকল দেশের পাঠকদের কাছে স্বদেশি-সাহিত্যকে পৌঁছানোর স্বার্থে সেসকল ভাষায় সাহিত্য রচনাকে নেতিবাচকভাবে দেখা ঠিক নয়। আমাদের বিবেচনায় আফ্রিকার সাহিত্য কোন ভাষায় রচিত হলো সেটা প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়। মুখ্য বিবেচ্য বিষয় হলো, যে সাহিত্যকর্ম রচিত হলো তার বিষয়বস্তু, স্বরূপ ও প্রকৃতি আফ্রিকী কি না? এমতাবস্থায় আফ্রিকী সাহিত্যের বিষয়বস্তু, স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক বলে বিবেচনা করি।

চার

আফ্রিকার সাহিত্য বলতে আমরা পূর্বে উল্লিখিত ভূগোলের ঐসব সাহিত্যকে নির্দেশ করতে চাচ্ছি, যাদের প্রেক্ষাপট একান্তভাবেই আফ্রিকী; যারা রূপবৈচিত্র্যে অসাধারণ এবং আকৃতিতেও বিশাল। সেখানে প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিত হবে সেই মহাদেশের মানুষের জীবনের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, জীবনাচরণ, সমাজকাঠামো ও মূল্যবোধ, উপনিবেশের নির্যাতিত জীবনযাপন ও এর প্রতিবাদ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংঘাত, পশ্চিমাদের অপরমানুষ হিসেবে দেখার প্রবণতা, প্রতিনিয়ত আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান, সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েন প্রভৃতি। যেখানে এসবের রূপায়ণে ব্যবহৃত হয়েছে দেশীয় কিংবা গোত্রীয় ঐতিহ্যবাহী আঙ্গিকের ব্যবহার, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে এসব আঙ্গিকের সঙ্গে আরবি ও পাশ্চাত্য সাহিত্য আঙ্গিকের মিশ্রণ। একারণে আফ্রিকার অধিকাংশ সাহিত্যিকই সাহিত্য রচনা করেন আফ্রিকী অনুভূতিকে ভিত্তি করে, বিষয়বস্তুতে আফ্রিকার স্বার্থের প্রতি অনুরক্ত থেকে এবং একটি আফ্রিকান আঙ্গিক তৈরি করে। বিষয়বস্তুকে রূপায়ণের প্রয়োজনে আফ্রিকার সাহিত্যিকেরা এরকম একটি মিশ্রআঙ্গিক তৈরি করলেও ইউরোপীয় সাহিত্যের সাথে আফ্রিকার সাহিত্যের প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে। ইউরোপীয় সাহিত্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সেখানে রূপায়িত হয়েছে ব্যক্তিজীবনের প্রতিচ্ছবি, পক্ষান্তরে আফ্রিকার সাহিত্য গোষ্ঠীজীবনের প্রতিচ্ছবি সেখানে রূপায়িত হয়েছে কৌমজীবনের পরম্পরার ছন্দ। সমালোচকের মতে,

'প্রকৃতির দিক থেকেও ইউরোপীয় সাহিত্য ও আফ্রিকার সাহিত্য ভিন্ন। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য মূলত অ্যাকাডেমিক; আফ্রিকার সাহিত্য প্রায়োগিক– তাদের জীবনাচরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ' (শাহেদ, ২০১২ : ৩১)। সমালোচকের এই মন্তব্য সর্বাংশে যথার্থ। এর প্রমাণ আমরা পাবো আফ্রিকার গল্পগুলোতে। সেখানে আমরা দেখবো যে, শত শত বছরের ঔপনিবেশিক শাসনে শোষিত ও শাসিত হওয়ার পরেও আফ্রিকার মানুষেরা তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বিস্মৃত হয়নি কিংবা পরিত্যাগ করেনি বরং সেগুলোকে তারা টিকিয়ে রেখেছিল, কারণ তাদের সংগ্রাম ছিল পশ্চিমা শাসনের বিপরীতে। এর পাশাপাশি তাদের ছিল নিজেদের দুঃখ ও দুঃখের কারণ সম্পর্কে সচেতনতা এবং অস্তিত্বরক্ষার জন্য সদাজাগ্রত সংগ্রামীচেতনা, যে চেতনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে আফ্রিকার সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণ। আফ্রিকার লেখকেরা যখন বুঝতে পেরেছেন প্রত্যক্ষভাবে কলোনাইজারদের অপশাসন ও শোষণের প্রতিকার কিংবা প্রতিরোধ সম্ভব নয়, তখন তাঁরা প্রতিরোধকে রূপায়ণের উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছেন সাহিত্যকে। সমালোচকের মতে,

> আফ্রিকাবাসীও বিশ্বাস করত যে সংস্কৃতি কিংবা নন্দনতত্ত্ব রাজনীতির ঊর্ধ্বে নয়। সংস্কৃতিকে হয় অত্যাচারিতের পক্ষে কিংবা অত্যাচারীর পক্ষে অবস্থান নিতে হবে; এর মধ্যবর্তী কোনো পথ নেই। বিদেশি শাসকদের শিক্ষা-সংস্কৃতিকে কৃত্রিমভাবে চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ তার মধ্যেই আফ্রিকার সংস্কৃতির বিকাশ (শাহেদ, ২০১২ : ২৩)।

বর্তমান পৃথিবীতে বিদ্যমান অসহিষ্ণুতা, অবিচার, ঊষরতা এবং বিপুল শূন্যতা থাকা সত্ত্বেও আফ্রিকার সাহিত্যিকেরা সকল দুর্ভাগ্যের ঊর্ধ্বে উঠতে চেয়েছেন। তাঁরা প্রার্থনা করেছেন একার জন্য নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। কেননা তাঁরা বিশ্বাস করেন, দুর্ভাগ্যের তিমির-রজনী পেরিয়ে পাখির কূজনের মধ্যদিয়ে নতুন সকাল অবশ্যই আসবে। তাঁরা আফ্রিকার একটি চিরন্তন প্রাচীনতায় বিশ্বাস করেন; একটি মৌলিক আদিম শূচিতার ওপর নির্ভর করেন এবং জনসাধারণের বিভিন্ন অভিচার, সম্মোহন ও কর্মের অভিব্যক্তিকে স্বাগত জানান। এদিক থেকে তাঁরা পূর্ণভাবে কৃষ্ণ আফ্রিকার প্রতীক। তাঁদের সাহিত্যকর্মে আমরা কৃষ্ণ-শোণিতের কথা শুনি, কৃষ্ণ-জীবনের অভয় পাই। তালবীথির কৃষ্ণ ঘনিষ্ঠতার প্রশ্রয় দেখি (শামসুজ্জামান, ২০১১ : ১২)। তাঁদের সাহিত্যভূবন "অনেক সময়ই আদর্শায়িত রোমান্টিক কল্পনাজাত, কিন্তু কাব্যিক সত্যে উদ্ভাসিত। এই ভূবনে কল্পনা আর বাস্তবের মাঝখানে যে সীমারেখা তা প্রায়ই ধূসর, দুর্নীরিক্ষ্য" (শামসুজ্জামান, ২০১১ : ১৩)। তাঁরা নিজেদের অনুভব উপলব্ধিকে তাঁদের সাহিত্যকর্মে অভিযোজিত করে নিয়েছেন। স্বীয় উপলব্ধিকে প্রকাশ করার জন্য কেউ কেউ বুলেটের মতো ভাষা ব্যবহার করে সংগ্রামে নেমেছেন সেইসব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যারা গোটা মহাদেশটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছিল। আফ্রিকাকে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে সে মহাদেশের কবি সাহিত্যিকদের ভূমিকা নির্দেশ করে কবি বেলাল চৌধুরীর বলেছেন,

> পর-রাজ্যলোভী সাদা মানুষদের একচেটিয়া প্রভুত্বের অধিকার খর্ব করে কৃষ্ণ আফ্রিকা আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। শুধু যে দাঁড়িয়েছে তাই নয়, বর্ণবাদ, আধিপত্যবাদ, উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামও করে যাচ্ছে। সেটাও আবার শুধু রণ-ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও লড়ছে সমানে সমানে অকুতোভয়ে। ব্রতী হয়েছে নিজেদের অতীত ইতিহাস ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের সঠিক মূল্যায়নে। যার

> ফলে, নতুন প্রজন্মের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা যেমন নিজস্ব শিকড়জাত সৃজনশীল রচনায় সমৃদ্ধ করে চলেছেন আফ্রিকার শিল্প-সাহিত্যাঙ্গন তেমনি তার সঙ্গে মূর্ত করে তুলেছেন কালো আফ্রিকার সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধ, ভালবাসা ও অকৃত্রিমতাকে। (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ১৬৪)

পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে আফ্রিকানরা যুক্তিবাদী মানুষ নন। একারণে আফ্রিকার কথা, কবিতা বা নৃত্যের তাল কখনোই কোনো যুক্তি ধরে এগোয় না; এখানে যুক্তির যোগ নেই। কিন্তু আফ্রিকার সাহিত্য পাঠে আমরা দেখি, আপাত যুক্তিহীন এই কবিতা বা নৃত্যের তালই তৈরি করে নতুন যুক্তি, কিংবা উন্মোচন করে নতুন সৃষ্টি রহস্যের দ্বার। আসলে পশ্চিমারা তাদের মতো করে আফ্রিকার সাহিত্যকে বিচার করতে চেয়েছে। তারা কখনো আফ্রিকান দৃষ্টি দিয়ে আফ্রিকার সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের বিচার করতে চায়নি। যদি তারা তা করত তাহলে বুঝত যে আফ্রিকার সাহিত্যিকদের "কাছে শব্দের থেকেও শব্দের মায়াবী ক্ষমতা বড়" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ২২৫)।

পাঁচ

ইংরেজি Colonialism শব্দের বাংলা পারিভাষিক শব্দ উপনিবেশবাদ। উপনিবেশবাদ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'উপনিবেশ' থেকে যার আভিধানিক অর্থ জীবিকা নির্বাহের জন্য অথবা স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য দলবদ্ধভাবে বিদেশে গিয়ে বসতি স্থাপন। তাহলে উপনিবেশবাদের অর্থ দাঁড়ায় জীবিকা নির্বাহের জন্য অথবা স্থায়ীভাবে অন্য জনগোষ্ঠীর ভূমিতে দলবদ্ধভাবে বাস করতে গিয়ে সেখানকার শাসনক্ষমতা দখল করে ঐ জনগোষ্ঠীর জনগণ, ভূমি ও সম্পদের ওপর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন ও এ সম্পর্কিত তত্ত্ব-দর্শন। এর সাথে সম্পর্ক রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের। "সাম্রাজ্যবাদ যদি হয় তত্ত্বদর্শন তবে উপনিবেশবাদ হলো এর প্রায়োগিক বাস্তবতা" (ফকরুল, ২০১১ : ১২)।

আফ্রিকার গল্প পাঠ করতে গেলে উপনিবেশ স্থাপন ও উপনিবেশবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ লিখিত বা আনুষ্ঠানিকভাবে আফ্রিকার অধিকাংশ দেশই পশ্চিমা কয়েকটি দেশের উপনিবেশে পরিণত হয় উনিশ শতকের শেষার্ধে, কিন্তু অলিখিত বা অনানুষ্ঠানিক উপনিবেশে পরিণত হয় তারও দু-তিন শতক আগেই, যখন থেকে ইউরোপের সাথে তাদের দাসব্যবসা চালু হয়। আমরা যদি তন্নিষ্ঠভাবে আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাসকে পাঠ করি, তাহলে আমরা প্রত্যক্ষ করব যে, আফ্রিকার ওপর কলোনাইজারদের শ্যেনদৃষ্টি পতিত হয়েছিল অনেক আগেই। যিশু খ্রিষ্টের জন্মেরও ১১০০ বছর আগে অ্যাসিরীয়রা আগ্রাসন চালায় উত্তর আফ্রিকায় এবং পরবর্তীকালে তাদের অনুবর্তী হয় পারসিয়ান ও রোমানরা। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের শুরুতে উত্তর আফ্রিকায় অভিযান চালায় মুসলিমরা এবং তারা আফ্রিকার উত্তর উপকূল দখল করে। পনেরো শতকে ঘানা, কঙ্গো, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক ও মোম্বাসায় বাণিজ্য ও বসতি স্থাপন করে পর্তুগিজরা। ষোলো শতকের শুরুতে পশ্চিমা উপনিবেশবাদের উপাদান নিয়ে তারা মোজাম্বিক দখল করে। সতেরো শতকে ডাচদের (সাবেক হল্যান্ড, বর্তমান নেদারল্যান্ড) একটি বণিকদল স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে দক্ষিণ আফ্রিকায়। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে তারা আফ্রিকায় প্রথম প্রতিষ্ঠা করে পশ্চিমা ঘরানার ঔপনিবেশিক

শাসন। তখন ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গদের পরিচয় ঘটল "এমন মানুষের সঙ্গে যার ত্বক কৃষ্ণবর্ণ, চুল কোঁকড়া, নাক চ্যাপ্টা আর চোখ রক্তিম। যে মানুষের হাসি সরল, যে মানুষ নাচ-গান দিয়ে তার সুখ-দুঃখকে প্রকাশ করত, যে মানুষ বর্তমান পর্যন্ত খরা, দৈন্য আর নানান কঠিন পরিস্থিতির প্রায়কিছুই জানত না– তাদের সম্পর্কে ঘোষিত হলো যে এরা মানুষ নয়" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ২২৫)। সেখানে তারা সাথে করে নিয়ে যায় অশ্বারোহী সৈন্য, আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ও খ্রিষ্টান মিশনারিদের। পর্তুগিজ ও ডাচদের দেখানো পথ ধরে পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় পাড়ি জমায় ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, স্পেন ও বেলজিয়ামের লোকেরা। এভাবেই সূচনা ঘটতে থাকে আফ্রিকায় প্রাক্-আধুনিক যুগের উপনিবেশ স্থাপনের। বিশ্বব্যাপী উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে দেখা দেয় ইউরোপে ১৭৬০–১৮৬০ কালপর্বে ঘটে যাওয়া শিল্প বিপ্লবের পর থেকে। শিল্পের কাঁচামালের অবিরাম সরবরাহের জন্য ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য দরকার ছিল খনিজ সম্পদ ও কাঁচামালের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহের এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত বিদেশি বাজারের। আর এই বাজার সন্ধান ও তা দখলের জন্য ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশের মানুষগুলো ব্যবসায়ী কিংবা ধর্মপ্রচারকের বেশ ধরে বেরিয়ে পড়ল এশিয়া, আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার দিকে। উনিশ শতকের আশির দশক থেকে আরম্ভ হয় পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো কর্তৃক আফ্রিকার বিভিন্ন দেশকে উপনিবেশ হিসেবে আত্মীকরণ করে নেওয়ার পালা। "ঔপনিবেশিক দেশগুলোর স্বার্থের টানাপোড়েনকে আপাতত ধামাচাপা দিতে ১৮৮৪–৮৫এর বার্লিন সম্মেলনে ইউরোপীয় শক্তিগুলো কার্যত আফ্রিকার মানচিত্রের উপর পেনসিলের দাগ দিয়ে সমগ্র অঞ্চলটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নেয়" (শাহেদ, ২০১২ : ১৬–১৭)। মানচিত্রের ওপর স্কেল বসিয়ে পেনসিলের দাগ দিয়ে ভাগ করে নেওয়ার কারণে আমরা দেখি যে, উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর সীমারেখা অনেকটা জ্যামিতিক সীমারেখার মতো।

আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাসের দিকে তাকালেও আমরা দেখবো যে, ইথিওপিয়া ও লাইবেরিয়া ব্যতীত আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় সব দেশই কোনো না কোনো পশ্চিমা দেশের উপনিবেশের শৃঙ্খল থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছে। মূলত বার্লিন সম্মেলনের পর থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত কালপর্বেই আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ইউরোপীয়দের উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। এই সময়ে ইতালি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল লিবিয়া ও ইরিত্রিয়ায়। পর্তুগাল অ্যাঙ্গোলা, কেপভার্দে, গিনি বিসাউ, মোজাম্বিক এবং সাওটোমে ও প্রিন্সিপে'তে। জার্মানি রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, ক্যামেরুন ও নামিবিয়ায়। স্পেন ইকুটোরিয়াল গিনি ও পশ্চিম সাহারা'য়। ফ্রান্স তিউনিশিয়া, আইভোরি কোস্ট, মাদাগাস্কার, নাইজার, সিসিলি, মৌরিতানিয়া, সেনেগাল, বারকিন ফাসো, জিবুতি, গিনি, আলজেরিয়া, গেবন, বেনিন, কঙ্গো, চাদ, মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র, কমোরোস'এ। বেলজিয়াম জায়ারে আর ব্রিটেন মালাবি, জাম্বিয়া, লোসেথো, উগান্ডা, কেনিয়া, সুদান, গাম্বিয়া, সোয়াজিল্যান্ড, ঘানা, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, সোমালিয়া, বতসোয়ানা, সিয়েরালিওন, মরিশাস, নাইজেরিয়া, মরোক্কো ও জিম্বাবুয়ে'তে।

ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো উনিশ শতক থেকে আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করে। "এজন্যে তারা

সবচেয়ে উর্বর জমিগুলো অধিগ্রহণ বা কিনে নিতে শুরু করে এবং যোগাযোগের সুবিধা সম্পন্ন জায়গাগুলোতে বসতি স্থাপন করে। এই কাজে যাতে বাধা না আসে সেজন্যে তারা স্থানীয় প্রভাবশালী মোড়ল-মাতব্বর, কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপজাতীয় প্রধানদের অর্থ বা সম্পদের বিনিময়ে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসে" (শাহেদ, ২০১২ : ১৭)।

'একমুঠো খেজুর' গল্পে সুদানের কথাসাহিত্যিক তায়েব সালেহ রূপকের আবরণে উপনিবেশ স্থাপনের চিত্র তুলে ধরেছেন। স্বাতন্ত্র্য ও রচনার অনন্য ও অনুকরণীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁকে এখনকার পৃথিবীর আরবি ভাষায় লেখকদের মধ্যে অগ্রগণ্য বলে মনে করা হয়। "আশ্চর্য তাঁর আখ্যান বিন্যাস, গল্প সাজাবার কৌশল, ভাষার আপাতসরল চালচলন– কিছুতেই কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব বা অভিঘাত নেই" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ১৭৪)। উত্তমপুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত এই গল্পটিতে গল্পকার নিপুণভাবে প্রতীকী পরিচর্যার মাধ্যমে দেখিয়েছেন উপনিবেশ স্থাপনের কৌশলকে। এই গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্রই প্রতীকী চরিত্র। কথকের দাদা ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতীক। হোসেন বেপারী, মুসা জোতদারসহ অপর দুইজন হলো ঔপনিবেশিক শক্তির সহযোগিদের প্রতিনিধি। মাসুদ সাহেব হলো উপনিবেশিত আফ্রিকার প্রতীক। গল্পটি সম্পর্কে অনুবাদক বলেছেন,

> প্রথমত দাদার সাথে দৈত্যের সাদৃশ্য এবং পরবর্তীতে মাসুদের কাহিনীতে সে দৈত্যের আত্মপ্রকাশ। দ্বিতীয়ত দাদার ধর্মচর্চা এবং ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের প্রত্যেকের একমুখিতা। তৃতীয়ত কলোনাইজড পরাভূত শক্তিরূপে মাসুদের অতীত ও বর্তমান। আর সর্বশেষ 'খেজুরের কলজে' এই রূপচিত্রের প্রতীকী ব্যঞ্জনা। (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩২৪)

আখ্যানের শুরুতেই আমরা পরিচয় পাই কথকের দাদার– যার শরীর লিকলিকে লম্বা, গালে লম্বা বুনো দাড়ি, নাক অস্বাভাবিক উঁচু; অনেকটা দৈত্যের মতো। তার সাথে কথা বলতে হলে মাথা আসমানের দিকে তুলে রাখতে হয়। তার দেহটা এতই উঁচু যে এমন কোনো ঘর নেই যে ঘরে ঢুকতে হলে তাকে মাথা নোয়াতে হয় না। অথচ তিনি মরুভূমির মাটির মতো রুক্ষ; কোনোদিনই হাসতেন না। এরপর পরিচয় পাই মাসুদ সাহেবের যিনি মুখে গান আর ঠোঁটে হাসি লাগিয়ে থাকা "একটা গোঁফ খেজুরে জাতীয় লোক" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩২৬)। তার হাসি ছিল নীল নদের স্বচ্ছ পানির অবিরল প্রবাহের ধারার মতো। গল্পকার মূলত এই দুই চরিত্রের (কথকের দাদা ও মাসুদ সাহেব) মধ্য দিয়ে পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তি ও উপনিবেশিত আফ্রিকাকে রূপায়িত করেছেন।

গল্পের কাহিনিতে কথক ও কথকের দাদার আলাপসূত্রে আমরা জানতে পারি যে, চল্লিশ বছর আগে কথকের দাদা যখন প্রথম এই এলাকায় আসেন তার এক ফেদান জমিও ছিল না। তখন এসবের মালিক ছিল মাসুদ। অথচ চল্লিশ বছরের ব্যবধানে আজ চিত্রটা ঠিক উল্টো। মাসুদ সাহেবের মোট জমির তিন ভাগের দুই ভাগ অর্থাৎ একশ ফেদান জমি, অগণিত খেজুর, স্যান্ট, সয়াল আর বাবলাগাছ যা মাসুদ সাহেব পেয়েছিল তার বাবার কাছ থেকে এখন তা কথকের দাদার হস্তগত হয়েছে। আর পরিস্থিতি এখন এমন যে, "ওপারের সমন পৌঁছার আগে মাসুদের বাকি জমিটুকুও আমারই হবে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩২৬)। কিন্তু কেন এমন হলো?

দাদার ভাষ্যমতে, এর কারণ মাসুদের বিয়ের নেশা। মাসুদ বিয়ে পাগলা মানুষ। প্রত্যেকবার বিয়ের সময় সে দুই ফেদান করে জমি বিক্রি করেছে। সেই হিসেবে গল্পকথকের মতে, মাসুদের নব্বইটির মতো বউ থাকা দরকার কিন্তু আছে মাত্র তিনটি বউ। তাদের শরীরও জীর্ণ-শীর্ণ। এছাড়া তার রয়েছে ল্যাংড়া একটি গাধা আর তালি দেওয়া একটি জামা যেটি গায়ে দেওয়ার ফলে "মাসুদ সাহেব এখন ফকির মাসুদ" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩২৭)-এ পরিণত হয়েছে।

—সাহেব মাসুদের ফকির মাসুদ হওয়ার কারণ হিসেবে দাদা যা বলেছে তা আসলে নতুন কিছু নয়। এগুলো কলোনাইজারদের বহুল কপচানো বুলিগুলোর অংশবিশেষ মাত্র। কলোনিয়াল শক্তিগুলো কলোনাইজডদের আসলে এভাবেই অভিহিত করেছে। তারা আদিম, অসভ্য, বর্বর, অলস, শিক্ষা ও সভ্যতার আলোহীন এবং নিজেরা নিজেদের শাসন করতে অক্ষম। এভাবেই তারা প্রথমে কলোনাইজড করেছে কলোনির মানুষের মনোজগতকে, বিভ্রম লাগিয়েছে তাদের দৃষ্টিতে, আবিষ্ট করেছে তাদের চৈতন্য। লক্ষ একটাই, তা হলো আমাদের মতো করে ভাবো, আমাদের চোখ দিয়ে বিশ্বকে দেখো সেইসঙ্গে নিজেকেও, নিজেদেরকেও। কারণ কাউকে দীর্ঘমেয়াদে শাসন করতে গেলে এই 'দেখা'টাকে নিয়ন্ত্রণ করা অতীব জরুরি। এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে সুগম হয় অনায়াসে রাজত্ব করার ও অবাধ লুঠতরাজের পথ। কলোনাইজাররা উপনিবেশের মানুষকে দমিয়ে রাখার জন্য সবসময় চেষ্টা করেছে তাদেরকে এই কথা বিশ্বাস করাতে যে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবেচনায় ইউরোপ উন্নত আর এশিয়া-আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার মানুষেরা শিকারী ও মৎস যুগের মানুষের ন্যায় অসভ্য, অসংস্কৃত ও নাবালক শিশু বিশেষ। তারা সামান্য সভ্যতার অধিকারী, আধা-বর্বর, অনমনীয় ও অর্ধ-বোধশক্তিসম্পন্ন উপকূলবাসী।

এরপরই গল্পের মূল ঘটনাটি সংঘটিত হয়। মাসুদ সাহেব খেজুর কাটতে যাবেন। তিনি কথকের দাদাকে অনুরোধ করেন খেজুর কাটার সময় উপস্থিত থাকতে। কিন্তু কথকের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, তিনি (মাসুদ) চাচ্ছিলেন না খেজুর কাটার সময় কথকের দাদা উপস্থিত থাকুক। তিনি মূলত অনুরোধ করার খাতিরেই কথকের দাদাকে অনুরোধ করেছিলেন। উপস্থিত থাকার অনুরোধ পেয়ে কথকের দাদা এক বাক্যে রাজি হয়ে যান। তাকে (কথকের দাদা) গরুর চামড়া দিয়ে মোড়ানো একটা টুলে বসতে দেওয়া হয়। কিন্তু মাসুদ সাহেব কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ভিড়ের মধ্যেও নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। খেজুর কাটা শুরু হয়। মাসুদ সাহেব খেজুর কাটা শ্রমিকদের অনুরোধ করেন, সাবধানে খেজুর কাটতে যেন খেজুরের কলজে না কেটে যায়। কারণ তিনি মনে করেন, "খেজুর গাছেরও আমাদের মতো কষ্ট আছে। ফূর্তি আছে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩২৮)। খেজুর কাটা হয়ে গেলে সেগুলো বস্তাবন্দি করা হয় এবং হোসেন ব্যাপারী, মুসা জোতদার ও কথকের দাদা মিলে সেগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। কারণ মাসুদ সাহেব তাদের কাছে ঋণী। কথকের দাদা মাসুদ সাহেবের কাছ থেকে পাঁচ বস্তা খেজুর নেওয়ার পরেও তার ঋণ পরিশোধ হয়নি। সে মাসুদ সাহেবকে জানায়, "আমি কিন্তু তোমার কাছে এখনো পঞ্চাশ পাউন্ড পাই" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩২৮)। নিজের প্রিয় খেজুরগুলোকে মহাজনদের নিয়ে যেতে দেখে মাসুদ সাহেব বাসা হারিয়ে ফেলা ইঁদুরের মতো ডানে-বাঁয়ে তাকাতে থাকেন। কথক তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে শুনতে পান, "তার ভেতরে একটি শব্দ। নেকড়ের থাবায় পড়া একটি মুমূর্ষু ছাগ শিশুর কান্নার মতো সে শব্দ"

(শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩২৮)। শব্দটি শোনার পর কথকের বুকটা জ্বলতে শুরু করে। তিনি দৌড়াতে থাকেন নীল নদের দিকে। তার মনে হয়, "আমি খেজুরের কলজে খেয়ে ফেলেছি। আমি গলায় আঙ্গুল দিয়ে চেষ্টা করলাম যা খেয়েছি সব বের করে আনতে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩২৮)।

—এখানে নেকড়ে আর কেউ নয়। সে দাদারূপী ঔপনিবেশিক শক্তি আর মুমূর্ষু ছাগশিশু হলো মাসুদ নিজে যে কিনা কলোনাইজড আফ্রিকার প্রতীক। খেজুরের কলজে হলো আফ্রিকার সত্তা আর খেজুরের কলজে খেয়ে ফেলা অর্থ আফ্রিকার সত্তাকে বিনাশ করা। আর গরুর চামড়া দিয়ে মোড়ানো টুল, যাতে বনেদিপনার ছাপ সুস্পষ্ট, ওটা আফ্রিকার অতীত ঐতিহ্যের পরিচায়ক।

ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অন্য আরেকটি রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় নগুগি ওয়া থিওয়ঙ্গ'ং রচিত 'ক্রুশ সকাশে বিবাহ'ং গল্পে। গল্পটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের কেনিয়ার মাউ মাউ বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে ভাগ্যান্বেষী এক যুবকের ভাগ্যান্বেষণ ও প্রতিশোধস্পৃহা অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। যুদ্ধকালে ইংরেজরা উপনিবেশের কালা আদমিদের বলপূর্বক যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছিল। তারা কৃষ্ণাঙ্গদের লোভ দেখিয়েছিল এই বলে যে বদমাশ জার্মানদের পরাজিত করতে পারলে চাকরি-বাকরি ও টাকা-কড়ি দেবে। কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভের পরে ইংরেজরা তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে যায়। গল্পকারের ভাষায়– "চাকরিই বা কোথায়, প্রতিশ্রুত পুরস্কারই বা কোথায়; 'সুমহান' ইংরেজ এবং 'শয়তান' জার্মানরা হেসে হেসে করমর্দন করলেন, কালা আদমিদের চাকরি দেওয়া হলো না কেন তা নিয়ে ওদের কোন মাথাব্যথা নেই" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩০৮)।

ছয়

আফ্রিকার বেশ কিছু গল্পে উপনিবেশবিরোধী চিন্তার রূপায়ণ ঘটেছে। এর মধ্যে ভেরোনিক তাজো'ং(১৯৫৫–) রচিত 'এক জাদুকর ও তরুণীর গল্প'টি'ং অন্যতম। গল্পটিতে গল্পকার জাদুবাস্তবতার কৌশল ব্যবহার করে কলোনাইজারদের কবল থেকে কলোনির মানুষদের মুক্তির উপায় অনুসন্ধানের চিত্র রূপায়ণ করেছেন। গল্পটি আরম্ভ হয়েছে "অসম্ভব ক্ষমতাধর ও অপরূপ সুন্দর এক জাদুকর" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩৩)-এর পরিচয় দেওয়ার মধ্য দিয়ে; যে জাদুকরের গুপ্তবিদ্যায় জ্ঞানের কোনো পরিসীমা নেই। সে যা চাইতো তা-ই করতে পারতো। সে দাবি করতো তার কাছে চিরশান্তির সূত্র আছে। লোকেরাও তার এসব কথা বিশ্বাস করতো এবং এ কারণে দশ জায়গা থেকে লোক আসতো তার সাথে দেখা করার জন্যে। অথচ সুখ সম্পর্কে সেই জাদুকরের ধারণা হলো, "সুখ হলো সুখের অনুপস্থিতি" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩৩)। কিন্তু সুখ সম্পর্কে সাধারণ আফ্রিকানদের ধারণা, "সুখ হচ্ছে ভালোবাসা, টাকা কিংবা ক্ষমতা" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩৪)। এরপর আমরা দ্বিমুখী ঘটনা ঘটতে দেখব যেখানে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লোকদের মধ্য থেকে একদল লোক জাদুকরের মুখ থেকে কাঙ্ক্ষিত কথা শুনতে না পেরে চলে যাবে আর একদল লোক জাদুকরের কাছে রয়ে যাবে।

জাদুকরের মুখ থেকে কাঙ্ক্ষিত কথা শুনতে না পেরে যে শ্রেণির লোক জাদুকরকে ছেড়ে চলে গেল তারা আফ্রিকার নিজস্বতায় বা স্বকীয়তায় বিশ্বাসী জনসাধারণ। ঔপনিবেশিক প্রভুদের মিথ্যাবচনে আশ্বস্ত হয়ে এরা নিজেদের স্বকীয়তা বিসর্জন দেয়নি। কিন্তু যারা "তার গুপ্ত কথা

কোন একদিন আবিষ্কার করবে বলে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩৪) জাদুকরের সঙ্গে রয়ে গেল এরা হলো ঐ শ্রেণির লোক যারা মনে করেছিল ঔপনিবেশিক প্রভুদের অনুসরণ, অনুকরণ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মধ্যেই তাদের মুক্তি নিহিত রয়েছে। এই কারণে এরা জাদুকরের সমস্ত ক্রিয়া-কর্মের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে ছিল বেশি পরিমাণে উদ্‌গ্রিব, সচেষ্ট, সতর্ক। এরা ছিল সবচাইতে অসুখী এবং তাদের যাওয়ার কোনো জায়গাও ছিল না। তারা সবদিক দিয়েই ছিল জাদুকরের ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে জাদুকর–

> যদি এমনিতেই একটা হাত উঠাতো, অমনি তারা এর অর্থ উদ্ধারে নিমগ্ন হয়ে পড়তো। রীতিমতো সভা ও গোল টেবিল বৈঠকে বসে যেত। তার প্রতিটি পদক্ষেপের মর্মার্থ উদ্ধারের জন্যে তারা কঠিন পরিশ্রম করে গলদঘর্ম হতো। সে কখন মাথা চুলকালো, কাশলো কি না, হাই তুললো কিংবা আঙ্গুল ফোটালো, আর তৎক্ষণাৎ তার সাগরেদরা খাতায় তা টুকে নিতো। অতি উৎসাহী কেউ আবার ছবিও এঁকে ফেলতো (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩৪)।

এরপর জাদুকরের কাছে আগমন ঘটে এক মেয়ের। "মেয়েটার জন্ম এক ম্যাজিশিয়ান পরিবারে। ওর বাবা একজন জাদুকর আর ওর মায়ের আছে অলৌকিক ক্ষমতা" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩৪)। জাদুকরের সাথে মেয়েটার সাক্ষাৎ হয়। মেয়েটার কথা শুনে জাদুকর বলে, "আমি বুঝতে পেরেছি, আসো আমার সাথে, কিন্তু কোনো প্রশ্ন কোরো না" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩৫)। জাদুকর মেয়েটাকে প্রশ্ন করতে নিষেধ করে তাকে অনুসরণ করতে বলে। মেয়েটাকে সাথে নিয়ে সে এক "গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়ে। মেয়েটা তার পাশে পাশে, সে জানে না তারা আসলে কোথায় যাচ্ছে কিন্তু এটা স্পষ্ট জানে একা সে কোন দিনও ফিরে আসতে পারবে না" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩৫)।

–ওপরে বর্ণিত জাদুকর আর কেউ নয়, সে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতিভূ। আর মেয়েটা উপনিবেশিত আফ্রিকার ঐ শ্রেণির মানুষদের প্রতিনিধি যারা চেষ্টা করেছিল কলোনাইজারদের তৈরি করা মিথকে ভেঙে দিয়ে আফ্রিকাকে মুক্ত করতে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কলোনাইজারেদের কাছ থেকে শক্তি সঞ্চয় করে সেই শক্তি কলোনাইজারদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা। এজন্য যখন জাদুকর ঘুমিয়ে পড়ে তখন–

> মেয়েটা উঠে বসে। লোকটার কপালে হাত রাখে এবং তার মাথার খুলিটা খোলে। খুলির ভেতরের দৃশ্য তাকে ভীত করে তোলে– দুঃখ আর একাকীত্বের একটা মরুভূমি। দেখতে ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রের মতো। চারদিকে পরিখা আর গোলার আঘাতে সৃষ্ট গর্ত। মৃতদেহের আড়ালে মাটি প্রায় চোখেই পড়ে না। এদিকটায় চলে আসার জন্য তার অনুশোচনা হল, বিমর্ষ মনে ফিরে আসার সময় হঠাৎ তার চোখে পড়ল দূরে, একটা হ্রদ, হ্রদটার ওপারে সমতল মাঠ, ঘাসগুলো অদ্ভুত, সবুজ যেন হাসছে। পৃথিবীটা ওখানে অনেক অর্থপূর্ণ। সে লোকটার খুলিটা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়। (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩৪)

–ওপরে যে অর্থপূর্ণ পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে, সেই পৃথিবী হলো কলোনাইজারদের নিজ দেশ অর্থাৎ ইউরোপ। কলোনাইজাররা যদিও বলেছিল যে তারা কলোনির দেশগুলোর আদিমতা, অসভ্যতা, বর্বরতা, আলস্য ও সভ্যতার আলোহীনতা ইত্যাদি দূর করার জন্য, শিক্ষার আলো দিবে, যাতে তারা নিজেরা নিজেদের শাসন করতে সক্ষমতা অর্জন করে। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা ছিল তার উল্টো। তারা কলোনির দেশগুলোকে এমনভাবে স্বল্পশিক্ষা দিয়েছিল যাতে তারা দীর্ঘমেয়াদে কলোনিগুলোকে শাসন করতে পারে। কিন্তু আলোচ্যমান গল্পের মেয়েটার মতোই

কলোনিগুলোতে কিছু মানুষ ছিল যারা কলোনাইজারদের কবল থেকে নিজের দেশকে মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর। তাই তারা কলোনাইজারদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে, তাদের সাথে মিশেই তাদের নাগপাশ থেকে মুক্তির উপায় সন্ধান করে। এ জন্যই– "সেই সময় থেকে, মেয়েটার মনে শুধু একটাই চিন্তা কী করে লোকটার মনের ভেতর সেই বিস্তৃর্ণ উপত্যকায় পৌঁছানো যায়। সে ঐ সবুজ ঘাসে গড়াবে, ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ নিবে, গায়ে মাখবে তার উষ্ণতা। এই চিন্তা মেয়েটাকে আচ্ছন্ন করে রাখলো। রাতদিন সে জাদুকরের সাথেই যাপন করছে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩৫-৩৬)।

মুক্তির বিশল্যকরণী আনার উদ্দেশ্যে মেয়েটা আবার জাদুকরের খুলিতে ঢুকবে বলে মনস্থির করে। যাত্রা শুরু করার আগে নিজেকে সে ভালোভাবে তৈরি করে নেয়। সে আরও সচেতনতা অবলম্বন করে এবং সমস্ত শক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়। সে একটা ডিম ভেঙে কুসুম দিয়ে তিনবার মুখ ধুয়ে নেয়। তারপর এগিয়ে যায় ঘুমন্ত লোকটার কাছে। সে জাদুকরের কপালে হাত রাখে এবং তার মাথার খুলিটা খুলে ফেলে সেখানে প্রবেশ করে এবং সাবধানে হাটতে থাকে। লেখকের ভাষায়–

> মেয়েটা খুব সাবধানে হেঁটে যাচ্ছিল, কিন্তু তার কামিজের ঝুল কাঁটায় জড়িয়ে যায়, একটা ফাঁদে পড়ে গিয়ে আহত হয় সে। তারপরও বেশ সাফল্যের সাথে পুঁতে রাখা মাইন এড়িয়ে, পচাগলা লাশের গন্ধের ভেতর শ্বাস বন্ধ রেখে, সে এগিয়ে যায়। এবং শেষ পর্যায়ে সে হ্রদটার কাছে এসে পৌঁছায়। কিন্তু ততক্ষণে সে ভীষণ ক্লান্ত ও ভয়াবহ রকমের তৃষ্ণার্ত। সে হ্রদটার তীরে বসে। আজলায় ভরে কিছু পরিষ্কার পানি পান করে (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩৬)।

পানি পান করে সমস্ত শক্তি ফিরে পাবার পর সে লম্বা একটা দম নিয়ে আবার হ্রদে ডুব দেয়। এদিকে জাদুকর বিছানায় অস্থিরতা বোধ করে। ঘুমের মধ্যে সে প্রায় লাফিয়ে ওঠে। জেগে উঠেই সে চোখ মেলে তাকায় রুমটার চারদিকে। তারপর বিছানা থেকে প্রায় লাফিয়ে নামে। গোলকধাঁধাঁর গোড়ায় দাঁড়িয়ে সে মেয়েটার নাম ধরে ডাকতে থাকে। কিন্তু ততক্ষণে মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। তখন মেয়েটার অবস্থা– "একটা উচ্চতর শক্তি মেয়েটাকে হ্রদের তলার দিকে টেনে নিতে থাকে। মেয়েটা জানতো সে গভীর থেকে গভীরে তলিয়ে যাবে। হ্রদের পানি তার মুখ, কান, নাক ছাপিয়ে যায়। তার গলায় কোন আর্তচিৎকার আসে না। সে কেবল তীরের কথা মনে করতে পারে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩৬)।

–এখানে উচ্চতর শক্তি হলো পশ্চিমের উন্নতশিক্ষা বিশেষত বিজ্ঞানশিক্ষা, যা ব্যক্তির মধ্যে চিন্তা-চেতনা, মননশীলতা, সচেতনতা ও স্বাধিকার চেতনার উন্মেষ ঘটায়। আর্তচিৎকার না আসার কারণ হলো ঔপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে বের হয়ে মুক্তির স্বাদ পাওয়া। তীর হলো তার স্বদেশ। আর জাদুকরের অস্থিরতার কারণ হলো কলোনির নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয়।

গল্পটিতে লক্ষণীয় যে, গল্পকার উপনিবেশবিরোধী ভাবনার রূপায়ণ ঘটাতে গিয়ে জাদুবাস্তবতার কৌশল ব্যবহার করেছেন। এর কারণ জাদুবাস্তবতায় সম্ভব, অসম্ভব এবং অবিশ্বাস্যর সংমিশ্রণ ঘটে। এখানে চরিত্ররা ইচ্ছেমতো আকার বদলাতে পারে আবার মৃত্যুকালে উড়ে যেতে পারে। এধরনের লেখায় থাকে গ্রামীণ আবহ, রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ্র এবং কাল্পনিক অঞ্চল। এখানে কাহিনি বর্ণিত হয় ক্ষমতাবঞ্চিত মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে, গল্প তৈরি হয় রাজনৈতিক ক্ষমতাবঞ্চিত মানুষ ও প্রভাববিস্তারী সমাজকে নিয়ে। এই রীতিতে ভূতের আবির্ভাব,

লোকজনের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, অলৌকিক ব্যাপার, অসাধারণ ক্ষমতা, এসবের আনয়ন করা হয় মূলত বাস্তবতাকে নির্দেশ করার জন্য এবং সেই সত্যের অনুসন্ধান করার জন্য যা প্রাত্যহিকতার আড়ালে থাকে।

ইভোন্নি ভেরা রচিত 'অন্য পশু কেন খোদা করো না' গল্পেও উপনিবেশবিরোধী ভাবনার রূপায়ণ দেখতে পাই। গল্পটিতে গল্পকার একজন কাঠখোদাইকারীর চিত্র রূপায়ণের মধ্য দিয়ে উপনিবেশবিরোধী চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। এই গল্পের কাঠখোদাইকারী স্বচক্ষে কখনোই হাতি অথবা জিরাফ দেখেনি, অথচ এগুলোই সে অত্যন্ত উৎসাহে এত সুন্দর ও নিখুঁতভাবে খোদাই করে যে, তার খোদাই করা হাতি ও জিরাফগুলো দেখে মনে হয়, এই ভাস্কর বাস্তব অরণ্যকে তুলে এনেছে শহরে। অথচ সব সময় তার মনে দুঃখ এই কারণে যে, এগুলোর জীবন নেই। সে সব সময় শুধু হাতি ও জিরাফ ব্যতীত অন্য পশুদের খোদাই করে না।

—উপরে বর্ণিত হাতি কেবল হাতি নয়, সে আফ্রিকার স্বদেশি কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের প্রতীক, আর জিরাফ পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গদের প্রতীক। হাতি আফ্রিকার নিজস্ব সন্তান; সে-ই আফ্রিকার আসল মালিক কিন্তু সে কাদায় গড়াগড়ি করে দিন কাটায়। অথচ জিরাফ বাইরে থেকে এসে আফ্রিকাকে দখল করে নিয়ে সে-ই এখন বনের মালিক হয়ে গেছে। সে তার লম্বা গলা নিয়ে সদর্পে বিচরণ করছে এবং গাছের সবচেয়ে উঁচু পাতা খাচ্ছে। এখানে হাতির কাদায় গড়াগড়ি করা অর্থ সুবিধা বঞ্চিত হওয়া আর জিরাফ কর্তৃক গাছের সবচেয়ে উঁচু পাতা খাওয়ার অর্থ সকল সুবিধা ভোগ করা। মূলত এক ধরনের প্রতিশোধস্পৃহা বা অ্যান্টি-কলোনিয়াল মানসিকতা থেকেই ভাস্করটি অন্য পশুদের খোদাই করে না। গল্পকারের বর্ণনায় প্রকাশিত হয়েছে সে সত্য—

> হাতি দীর্ঘকাল ধরে বন শাসন করছে। সে বনের চেয়েও প্রবীণ। কিন্তু জিরাফ গাছের ওপর দিয়ে তার গলা লম্বা করে সদর্পে চলাচল করে, যদিও সে-ই বনের মালিক। সে সবচেয়ে উঁচু গাছের পাতা খায়। অথচ হাতি কাদায় গড়াগড়ি করে দিন কাটায়। ... বনের সব চেয়ে উঁচু গাছের পাতা খাওয়ার জন্যে হাতি আর জিরাফের এই সংগ্রাম। (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩১)

—ওপরে যে সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে সেটা আফ্রিকানদের নিজস্ব অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গদের সংগ্রাম। এই সংগ্রামের অন্যতম একটি কারণ তাদের গাত্রবর্ণ। গল্পকারের ভাষায়,

> জিরাফ গর্বিত ও রাজকীয় ভঙ্গিতে হাঁটে, এর কারণ হচ্ছে তার সুন্দর চিত্রিত চামড়া, যা সে তার পিছে বহন করে। সংগ্রামটা হচ্ছে এখানে। এছাড়া তাদের দু'জনের যোগ্যতাই সমান। হাতির আছে উঁচু শুড় যা সহজেই উঁচু পাতায় গিয়ে পৌছায়। তেমনি জিরাফের রয়েছে লম্বা গলা (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩২)।

গল্পের শেষে আমরা দেখি ভাস্করটি জিরাফের গায়ে কালো রঙের ছোপ দিয়ে তাকে জেব্রা বানিয়ে ফেলেছে। খোদাইকারী কর্তৃক খাটো গলার জিরাফের গায়ে কালো রঙের ছোপ দিয়ে তাকে ছোট জেব্রা বানিয়ে ফেলার মধ্যে এক ধরনের প্রতিশোধ স্পৃহা বা বদলা নেওয়ার মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে।

সাত

আফ্রিকার গল্পে 'বর্ণবাদ' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ শ্বেতাঙ্গশাসিত আফ্রিকার জীবন ও সমাজে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী, যা কৃষ্ণাঙ্গদের জীবন ও মানসিকগঠনে ভয়ানকভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। আফ্রিকার ছোটগল্পে রূপায়িত বর্ণবাদের স্বরূপ নির্দেশের পূর্বে বর্ণবাদ সম্পর্কে সামান্য আলোচনা আবশ্যক বলে বিবেচনা করি। প্রায় দুশো বছরেরও অধিক সময় ধরে আফ্রিকাকে শাসন ও শোষণ করতে গিয়ে পশ্চিমা শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশবাদীরা যে সকল নিকৃষ্ট নীতি, কৌশল ও পথ অবলম্বন করেছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল Apartheid বা সাংবিধানিক বর্ণবাদ। Apartheid শব্দের বাংলা পারিভাষিক অর্থ হলো বর্ণবাদ। শব্দটি একটি আফ্রিকী আঞ্চলিক শব্দ যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বর্ণ বা জাতি পৃথক্করণ। এটা আসলে জাতিবৈষম্য (Racial Discrimination) ও বর্ণ পৃথকীকরণের একটি সুসংহত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ যেখানে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষগুলোকে নিজদেশেই পরিণত করা হয়েছিল দাসে কিংবা চাকরে। বর্ণবাদকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে সাহায্য করেছিল পাশ্চাত্য বিভিন্ন মনীষী ও শ্বেতাঙ্গ রাজনীতিকের বাণী। স্কট দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৭১১-৭৬) মনে করতেন, "নিগ্রো স্বভাবতই শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে নিকৃষ্ট" (উদ্ধৃত, শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ১৭৭)। যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসন (১৭৪৩-১৮২৬) এর মতে, "কালোরা দেহ এবং মন, দুয়েরই সহজাত গুণপনার দিক দিয়ে, সাদাদের চেয়ে নিকৃষ্ট" (উদ্ধৃত, শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ১৭৭)। জোসেফ ডি মাইস্ত্রে বলেছিলেন,

> যদি ভবিষ্যতের সমাজ কোনো দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত হয়, তার শাসকশ্রেণি হবে স্বর্ণকেশী, নীলচক্ষু শ্বেতাঙ্গ আর সমস্ত বিচ্ছিরিরকম কায়িকশ্রম সম্পন্ন করার জন্যে থাকবে নিকৃষ্টতর একটি শ্রেণি, এবং এটা খুব সম্ভব যে সেই ভূমিকা গিয়ে পড়বে হলদে বা কালা আদমিদের ওপর (উদ্ধৃত, শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ১৭৮)।

বর্ণবাদী শাসন ব্যবস্থায় বিদেশি শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা আফ্রিকার স্বদেশি কৃষ্ণাঙ্গরা শোচনীয়ভাবে শাসিত, শোষিত ও নিগৃহীত হয়েছে। সমালোচকের মতে,

> বর্ণবাদী ব্যবস্থায় কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরা ছিল নিজ দেশেই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। মানুষ হিসেবে প্রাপ্য তাঁদের বহু অধিকার শ্বেতাঙ্গ আইনে অনেক পরিমাণে ছিল অস্বীকৃত। নিজ মাতৃভূমিতে তাঁদের বিচরণের অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল অনেকটা; বাধ্যতামূলক শ্রম, কাজের অধিকার অনেক সময় ছিল নেতিবাচকভাবে সংরক্ষিত। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রায় সকল নাগরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল তাঁরা। মাতৃভূমির বিপুল খনিজ ও অন্যান্য সম্পদের উপর তাঁদের কোনো অধিকার কিংবা স্বত্ব ছিল না (শাহেদ, ২০১২ : ১৯-২০)।

তবে Apartheid এর বাংলা পরিভাষা হিসেবে শুধু জাতি পৃথক্করণ বললে বর্ণবাদের যে স্বরূপ আমাদের সামনে ফুটে ওঠে Apartheid এর প্রকৃতরূপ ছিল তার চেয়েও অনেক বেশি 'ভয়ংকর ও অমানবিক' (শাহেদ, ২০১২ : ১৯–২০)। সোমা মুখোপাধ্যায়ের মতে,

> দক্ষিণ আফ্রিকায় আপার্টহাইড (Apartheid) নামক বর্ণবৈষম্য নীতির দরুন দক্ষিণ আফ্রিকার শাসকগোষ্ঠী ছিলো সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গরা এবং তিন স্তরে বিভক্ত অশ্বেতকায় গোষ্ঠীর প্রথম স্তরে থাকতো বর্ণসঙ্কর সম্প্রদায়, এশিয়ার মানুষ দ্বিতীয় স্তরে এবং তৃতীয় স্তরে সংখ্যাগুরু আফ্রিকীয় উপজাতির কৃষ্ণাঙ্গরা থাকতো (বিষ্ণু, ২০০৫ : ২১)।

সংক্ষেপে এই আইনের কতিপয় দিকের প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করতে পারি : বর্ণবাদ আইনের কারণে দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায় কৃষ্ণাঙ্গদের নিজস্ব বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে প্রতিষ্ঠা করা হয় বিপুল সংখ্যক ঘোষিত ও অঘোষিত শ্বেতাঙ্গ এলাকা। শ্বেতাঙ্গরা ৭০ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য বরাদ্দ করে আফ্রিকার মোট ভূখণ্ডের ১৩ শতাংশ অনুর্বর জমি ও সম্পত্তি, আর ৩০ শতাংশ শ্বেতাঙ্গদের জন্য বরাদ্দ করে ৮৭ শতাংশ উর্বর ভূমি ও সম্পত্তি; প্রবর্তন করে 'পাস–আইনের'। এর ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গরা নিজদেশে অবাধে চলাচলের অধিকার হারায়। প্রত্যেক কৃষ্ণাঙ্গকে চলাচলের এলাকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় এবং পাস বা পরিচিতি বই রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়। পাস বা পরিচিতি বই না রাখলে দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশ তাকে আটক ও জরিমানা করতো। গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত কোনো কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করলে পুলিশ তাকে আটক করে বাধ্যতামূলক শ্রমে নিয়োগ করতে পারতো।

বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন করে রাখতো। একজন কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক একই এলাকায় একটানা ১৫ বছর কাজ করলে তবেই পরিবারের সাথে থাকার অনুমতি পেত। কিন্তু বাস্তবে এটা ছিলো প্রায় অসম্ভব কারণ, শ্রমিকদের সাধারণত এক থেকে দেড় বছরের 'ওয়ার্ক পারমিট' দেওয়া হতো এবং সামান্য অজুহাতেই তাকে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় পাঠিয়ে দিতো। আবার কোনো কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক অসুস্থ হয়ে কয়েক দিনের জন্য শহরের বাইরে গেলে অথবা আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করতে গিয়ে কয়েকদিন থাকলে তাকে শহরচ্যুত করা হতো। কোনো শ্রমিক দৈহিকভাবে দুর্বল বা অক্ষম হয়ে গেলে তাকে চাকরিচ্যুত করা হলেও এর জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ বা আর্থিক সুবিধাপ্রদান করা হতো না।

বর্ণবাদ আইনের কারণে কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের কর্ম এবং কর্মস্থল নির্বাচনের অধিকার ছিলো না। এই অধিকার ছিলো একচেটিয়াভাবে শ্বেতাঙ্গ নিয়ন্ত্রিত সরকারি শ্রমসংস্থাগুলোর। সংস্থাগুলো স্বাস্থ্য-পরীক্ষার নাম করে এবং স্বাস্থ্যের অযুহাত দেখিয়ে শ্রমিকদের কাজের স্থান নির্ধারণ করতো। কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের প্রতিদিন গড়ে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে হতো কারখানায় বা খামারে। তাদের অধিকাংশই রাত কাটাতো কারখানার বাইরে কিংবা মালিকের বাসগৃহের বাইরে খোলা আকাশের নিচে। কিছু কিছু কারখানায় কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের জন্য টিনের তৈরি জানালা-দরজাহীন ঘর থাকলেও এধরনের এক একটি ঘরে ২০/২৫ জন শ্রমিককে একত্রে রাত্রিযাপন করতে হতো। স্বাস্থ্য পরিচর্যার কোনো ব্যবস্থা তাদের ছিলো না। তাদের সন্তানের লেখাপড়ার সুযোগও ছিলো সামান্য। তাদের যা মজুরি দেওয়া হতো তা ছিলো তাদের পরিবারের অন্নসংস্থানের জন্য অপ্রতুল, উপর্যুপরি কাজে বিলম্ব করলে বা অনুপস্থিত থাকলে গুরুতর শাস্তির বিধান ছিলো। কৃষ্ণাঙ্গরা শুধু কাজের জন্যই শ্বেতাঙ্গদের এলাকায় যেতে পারতো এবং এর জন্য প্রয়োজন ছিলো পূর্বানুমতি গ্রহণের। তাদের কোনো ভোটাধিকার ছিলো না। নির্বাচনে শুধু প্রাপ্তবয়স্ক শ্বেতাঙ্গরাই ভোট দিতে পারত। প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীসহ সরকারের সকল গুরুত্বপূর্ণপদ শুধু শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। শ্বেতাঙ্গরা একজন কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান দার্শনিকের চেয়ে একজন শ্বেতাঙ্গ গাধাকেও অধিকতর প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করত।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোনো কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক কর্তৃক শ্বেতাঙ্গ মালিকের সাথে তর্ক বা বাদানুবাদ ছিলো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। একারণে তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে জবাবদিহি করতে হতো। আবার শ্বেতাঙ্গ মালিক কর্তৃক কোনো কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকের উপর দৈহিক

নির্যাতনকালে কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক শারীরিকভাবে বাধা প্রদান করলে শ্বেতাঙ্গ মালিক পুলিশের সাহায্য নিতে পারতো। মালিকের অনুমতি ব্যতীত কোনো শ্রমিক চাকরি ত্যাগ বা পরিবর্তন করতে পারতো না। চাকরি ত্যাগ বা পরিবর্তন করতে চাইলে তাকে প্রচলিত শ্রম আইন অনুযায়ী পুলিশের কাছে মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে হতো। তবে এক্ষেত্রে ফল হতো উল্টো। পুলিশ অভিযোগকারী শ্রমিককে দৈহিকভাবে নির্যাতন করে আগের মালিকের কাছেই পাঠিয়ে দিতো। সেখানে তার ভাগ্যে জুটতো সীমাহীন নির্যাতন। এ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, শ্বেতাঙ্গসৃষ্ট বর্ণবাদী শাসনের অধীনে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষগুলো কী পরিমাণে শোচনীয়, মানবেতর ও লজ্জাজনক জীবনযাপন করছিলো। এর পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার ১৯১৩ সালে Native Land Act-এর মাধ্যমে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য ভূমি ও সম্পত্তি কেনার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়। এই আইনের কারণে কৃষ্ণাঙ্গরা মাত্র সাত শতাংশ ভূমি ক্রয় করতে পারতো। ১৯৩৬ সালে এই আইন সংশোধন করে এই পরিমাণ তের শতাংশ স্থির করা হয়। ফলে মোট জনসংখ্যার ৮৩ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয় ১৩ ভাগ জমির মধ্যে আর ১৭ শতাংশ শ্বেতাঙ্গের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় আফ্রিকার ৮৭ ভাগ ভূমি। এ রকম মানবেতর পরিস্থিতিতে কৃষ্ণাঙ্গরা জীবন বাঁচানোর জন্য শ্বেতাঙ্গদের সস্তা শ্রমিকে পরিণত হয়।

আফ্রিকার যে সকল সাহিত্যিকদের ছোটগল্পে বর্ণবাদের নিপুণ রূপায়ণ ঘটেছে তাঁদের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার নোবেল বিজয়ী শ্বেতাঙ্গ লেখিকা নডিন গার্ডিমার[৯] (Nadine Gordimer) অন্যতম। তিনি ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার সেই সব প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের অন্যতম যাঁরা বর্ণবাদকে অপছন্দ করতেন। গল্পে তিনি অব্যাহতভাবে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন বর্ণবাদকে এবং এর ফলে সৃষ্ট মানবিক সংকটকে। তাঁর লেখায় শ্বেতাঙ্গদের অপরাধবোধ, ভয়, বিচ্ছিন্নতা ও সার্বিক মানসিক অস্থিরতার চিত্রের পাশাপাশি ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গদের আধিপত্য ও বর্ণবাদী বর্বরতায় বিপর্যস্ত কালোদের জীবনচিত্র রূপায়িত হয়েছে। এছাড়াও রূপায়িত হয়েছে উপনিবেশে বাস করার সহজাত অবমাননা, নির্যাতন, প্রতিবাদ, পারিবারিক জীবন ও দাসত্বের চিত্র। তাঁর রচিত 'সাড়ে তিন হাত মাটি'[১০] গল্পে রূপায়িত হয়েছে বর্ণবাদের ভয়াবহতা এবং সেই ভয়াবহতার চিত্র রূপায়ণে তিনি আবেগপ্রবণ ও অনুভূতিসম্পন্ন। গল্পটিতে বিধৃত হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গের নিকটবর্তী এক শ্বেতাঙ্গের খামারে রোডেশিয়া থেকে আগত এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবকের স্বপ্নভঙ্গ, দুঃসহ জীবনযাত্রা, মৃত্যুর বিবরণ এবং বর্ণবাদী ঘেরাওয়ে জীবনের বিচ্ছিন্নতা। এই গল্পটির একটি বিশেষ বিশেষত্ব হলো, গল্পের রচয়িতা একজন শ্বেতাঙ্গ নারী, অথচ তিনি গল্প বর্ণনা করছেন একজন পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে, আবার তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু হলো কৃষ্ণাঙ্গদের জীবন ও সেই জীবনে শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা সৃষ্ট বর্ণবাদের প্রভাব রূপায়ণ।

গল্পটির কথক একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ। তারই দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পটি বর্ণিত। তার একটি খামার রয়েছে কিন্তু তার মানে এই নয় যে সে কৃষিজীবী। খামারটি রাখার উদ্দেশ্য তার পারিবারিক দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে একটু পরিবর্তন আনা। স্ত্রীকে নিয়ে তার পরিবার। কথকের পরিবারটির অবস্থান জোহান্সবার্গ থেকে দশ মাইল দূরে। সে একটি ক্রমবর্ধমান ট্রাভেল এজেন্সির অংশীদার। তার স্ত্রী লেরিস একজন অভিনেত্রী। কথকের স্ত্রীর হাত দুটো ছিল কোমল, মসৃণ ও সযত্নে সুরক্ষিত কিন্তু খামারের কাজে মনোনিবেশ করায় তার "সেই কোমল হাত দুটো এখন কুকুরের থাবার নিচের মাংসের মতো বেশ শক্তপোক্ত হয়ে গেছে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৫৭)। শহর থেকে দূরে গ্রামীণ জীবনে কথকের পরিবারটি

খামারের শ্রমিক কালো আদমিদের নিয়ে বেশ ভালোই রয়েছে। কালোদের সাথে তাদের সম্পর্ক–

> ...সামন্ততান্ত্রিক বরং বলা চলে সবদিক বিবেচনায়– ঝামেলাহীন এবং স্বচ্ছন্দ। আমাদের বন্দুক অথবা চোর ঠেকানো প্রতিবন্ধকতার দরকার হয় না। খামারের লোকদের স্ত্রী এবং বাচ্চারা সবাই ফার্মের মধ্যেই বসবাস করে। ওরা নিজেদের হাতে টকমদ তৈরি করে– কোনো রকম পুলিশি তল্লাশির ভয় করার কিছু নেই। আমরা নিজেরাও সবসময় গর্ববোধ করি, যে ওরা আমাদের কাছে আছে বলেই ওদের ভয় করার কিছু নেই। লেরিস ওদের বাচ্চাদের দেখাশুনা করে এমনকি, ছেলে বুড়ো যে কেউ-ই অসুস্থ হলে চিকিৎসাও করে থাকে। (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৫৮)

এর বিপরীত চিত্রের সাথে পরিচিত হয় যখন, আমরা কথকের মাধ্যমে জোহান্সবার্গে অবস্থানকারী নাগরিকদের কথা শুনতে পারি। জোহান্সবার্গে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গরা অন্যদের সাথে আলাপ-আলোচনার সময় প্রতিনিয়ত যে সব দুঃশ্চিন্তা, প্রতিযোগিতা বা সংগ্রামের কথা বলে তার মধ্যে রয়েছে, "সাদা লোকদের বালিশের নিচে পিস্তল রাখার কথা এবং চোর ঠেকাতে জানালার পাশের প্রতিবন্ধকতার কথা... তাদের কথার মধ্যে আরও থাকে সাদা লোকদের দেখে কালোরা রাস্তার পাশে সরে দাঁড়ায় না– এ প্রসঙ্গটিও" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৫৮)।

–এই চিত্রটি পূর্বে বর্ণিত চিত্র হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়ে শ্বেতাঙ্গদের মনে যে ভীতি ও অশ্রদ্ধাবোধ তা-ও এখানে উন্মোচিত।

এরপরই কথকের খামারে একটি ঘটনা ঘটে যায়। তার খামারের কৃষ্ণাঙ্গ মজুর পেট্রাসের ভাই রোডেশিয়া থেকে পায়ে হেঁটে জোহান্সবার্গে এসেছিল কাজের খোঁজে। আসার পথে খোলা রাস্তায় রাত কাটানোর ফলে তার ঠান্ডা লাগে। ফলে ঠান্ডাজনিত শ্বাসকষ্ট তথা নিউমোনিয়ায় তিন দিন ভুগে সে মারা যায়। অসুস্থতার সময় তার চিকিৎসার জন্য খামারের কেউ কথককে কিংবা কথকের স্ত্রী লেরিসকে কিছু জানায় নি। তারা ভেবেছিল ঘটনাটা তারা সফলতার সাথে সামাল দিতে পারবে। কারণ পূর্বেও তারা এ ধরনের কিছু ঘটনা মালিকপক্ষকে না জানিয়ে সামলাতে পেরেছিল। পাশাপাশি অন্য একটি ভয়ও ছিল; তা হলো ছেলেটা ছিল রোডেশিয়া থেকে আসা অবৈধ অভিবাসী। আর "অনুমতি ছাড়া রোডেশিয়ার আদিবাসীদের জন্য ইউনিয়নে প্রবেশ নিষিদ্ধ" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৫৯) ছিল। তবে শুধু ছেলেটাই নয় ওদের বেশ কিছু আত্মীয়-স্বজনও প্রায় সাত/আটশ' মাইল হেঁটে দারিদ্র্য পীড়িত এলাকা থেকে কাজের সন্ধানে চলে আসে সোনার নগরী জোহান্সবার্গে।

–পেট্রাসের ভাইয়ের রোডেশিয়া থেকে কাজের সন্ধানে জোহান্সবার্গে আসার মূল কারণ শ্বেতাঙ্গ শাসকগণ কর্তৃক জোরপূর্বক কৃষ্ণাঙ্গদের ভূমি অধিগ্রহণ। সমস্যাটির সূত্রপাত হয় ১৯১৩ সালে যখন সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ শাসকদের আগ্রাসনকে ত্বরান্বিত করতে এবং নেটিভ কৃষ্ণাঙ্গদেরকে নির্যাতন ও বঞ্চিত করার প্রয়াসে প্রণয়ন করা হয় 'নেটিভ ল্যান্ড অ্যাক্ট'। এর পর থেকে রাতারাতি লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারকে বাস্তুচ্যুত করে খনি ও খামারের শ্রমিকে পরিণত করা হয়। শ্বেতাঙ্গদের তৈরি খামারগুলোতে সস্তাশ্রম সহজলভ্য করার জন্য খামারগুলোর কাছেই কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য শ্বেতাঙ্গরা বসতিও নিশ্চিত করে। শ্বেতাঙ্গরা দক্ষিণ আফ্রিকায় এমনভাবে

আইন তৈরি করেছিল যাতে শুধু তারাই দেশ শাসন করতে পারে। তারা শাসন ও শোষণের জন্য আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে তোলে 'রিজার্ভ এরিয়া'। তারা আফ্রিকার মোট ভূমির পনেরো শতাংশেরও কম জায়গার মধ্যে আবদ্ধ করতে চেয়েছিল সকল কৃষ্ণাঙ্গকে। এই কারণেই পেট্রাসের ভাই সহ অন্যান্য আত্মীয়দের কর্মসন্ধানে জোহান্সবার্গে আগমন।

পেট্রাসের ভাইয়ের মৃত্যুর পর দক্ষিণ আফ্রিকার আইন অনুযায়ী পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে খবর দেওয়া হয়। স্থূল বুদ্ধির পুলিশ সার্জেন্ট এসে তদন্ত করে যায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ লাশ নিয়ে গিয়ে ময়নাতদন্ত করে জানায়, ছেলেটার মৃত্যুর কারণ নিউমোনিয়া এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই নিজদায়িত্বে ছেলেটার দাফন সম্পন্ন করেছে। এই খবর জানার পরও পেট্রাস পারিবারিকভাবে দাফন করার জন্য কথকের কাছে তার ভাইয়ের লাশ ফেরত আনার জন্য অনুরোধ করে। কথক তাকে বুঝায় যে দাফন সম্পন্ন হয়ে গেছে, এখন আর মরদেহ পাওয়া যাবে না। পেট্রাস একথা বিশ্বাস করে না। সে ভাবে তার শ্বেতাঙ্গ মালিক হয়তো মরদেহটা আনতে চাইছে না। তার চোখের চাহনিতে এমন অভিব্যক্তির ছাপ স্পষ্ট। কথকের ভাষায়, "সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল এমন এক দৃষ্টিতে যা থেকে তার দৃঢ় বিশ্বাস ঠিকরে বের হচ্ছে– সাদা মানুষদের সব কিছুই আছে; যা ইচ্ছে তা বাস্তবে পরিণত করতে পারে এবং যদি কোনো কিছু না করে তাহলে বুঝতে হবে ইচ্ছে নেই" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৬২)।

পেট্রাসের সন্দেহ দূর করতে ও স্ত্রী লেরিসের অনুরোধের প্রেক্ষিতে কথক হাসপাতালে ফোন করে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কথককে জানায় যে, লাশ পাওয়া যাবে এবং এজন্য সর্বসাকুল্যে কুড়ি পাউন্ডের মতো অর্থ খরচ হবে, যা কিনা পেট্রাসের চার মাসের বেতনের সমান কিংবা তার পুরো পরিবারের এক বছরের কাপড়-চোপড়ের জন্য ব্যয়িত অর্থেও চেয়েও বেশি। কথক ভেবেছিল এত বড় অঙ্কের টাকা পেট্রাস যোগাড় করতে পারবে না, ফলে মরদেহও আনা লাগবে না। এমতাবস্থায় কথকের মনোভাব, "আমি নিজেও তাকে অর্থটা দেবার ব্যাপারে আগ্রহী নই। ছেলেটা বেঁচে থাকলে তার ডাক্তার দেখানো এবং ওষুধপত্রের জন্য শুধু কুঁড়ি পাউন্ড নয় প্রয়োজনীয় যে কোনো পরিমাণ অর্থ খরচ করতে আমার দ্বিধা ছিল না" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৬২–৬৩)। কিন্তু পরদিন সকালে কথক শহরে যাওয়ার আগেই দেখল, পেট্রাস একটা পোটলার মধ্যে জড়িয়ে কুড়ি পাউন্ড পরিমাণ অর্থ এনে তার হাতে দিল। কিন্তু সে এমন আনাড়িভাবে দিল যে, দেওয়ার ভিতরেও কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবে তার পশ্চাৎপদতার ছাপ সুস্পষ্ট। কথকের ভাষায়, "তার দেওয়া আনাড়িভঙ্গি বলে দেয়– তারা হতভাগার দল– শুধু নিতেই অভ্যস্ত কিন্তু দিতে জানে না। কীভাবে একজন সাদা মানুষের হাতে অর্থ তুলে দিতে হয়" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৬৩)। অর্থটা হাতে নিয়ে কথক বিস্মিত হওয়ার পরিবর্তে বিরক্তই হন। তার বিবেচনায় এটা গরিবদের পক্ষে একটা বড় আর্থিক বাজে ব্যয় এবং এরা মৃত্যুকে মহিমান্বিত করার জন্য জীবনকে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত করে। অথচ ঘটনাটা যদি তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে ঘটত তাহলে, "আমরা জীবনের জন্যে যে কোন পরিমাণ অর্থ অকাতরে ব্যয় করতে রাজি। আর মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের ধারণা– সে সময়ে আমাদের চূড়ান্ত দেউলিয়াত্বেও কিছু যায় আসে না" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৬৩)।

এদিকে খবর পেয়ে পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য "ছেলেটার বৃদ্ধ বাবা রোডেশিয়া থেকে দাফনে উপস্থিত হবার জন্যে রওয়ানা হয়েছে। তার অনুমতি মিলেছে এবং এখন পথে রয়েছে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৬২)।

—এখানে অনুমতি মেলা অর্থ 'পাশ' পাওয়া। উনিশ শতকের শেষ দিকে কৃষ্ণাঙ্গদের চলাচলের অধিকার সীমিত করে বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গরা চালু করে 'পাশ' প্রথা। পাশ আইনের মাধ্যমে প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে ও পরে সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে কৃষ্ণাঙ্গদের চলাচল সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। সেটারই ইঙ্গিত এখানে দিয়েছেন গল্পকার।

যাই হোক পেট্রাসের দেওয়া টাকায় হাসপাতাল থেকে ছেলেটার মরদেহ নিয়ে আসা হলো। মরদেহটিকে সমাহিত করার জন্য শোকযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে এবং সবাই মিলে যখন কফিনটাকে কাঁধে নিয়ে পদযাত্রা করে কবরস্থানের দিকে যাচ্ছে তখন পেট্রাসের বাবা কফিনের ওজন নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে এবং বলে, তার ছেলের ওজন এত ভারী হতে পারে না। তার যুক্তি, "আমার ছেলে বয়সে অল্প এবং হালকা-পাতলা ছিল" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৬৫)। বৃদ্ধের সন্দেহ দূর করার জন্য কফিন খোলা হলো। কিন্তু কফিন খুলে সবাই বিস্মিত কারণ, "কফিনের মধ্যে যে আছে তাকে উপস্থিত কেউই দেখেনি। নাদুস-নুদুস চেহারা— কিছুটা হালকা ত্বক, আর হালকাভাবে কয়েকটা সেলাই দেয়া সম্ভবত ঝগড়া-বিবাদের এক পর্যায়ে কেউ আঘাত করেছিল যার ধীর প্রক্রিয়ায় তার মৃত্যু ঘটেছে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৬৬)।

তাহলে এখন প্রশ্ন জাগতে পারে পেট্রাসের ভাইয়ের অবস্থা কী? এর উত্তরে গল্পকার আমাদের জানাচ্ছেন,

> তার হদিস কেউ জানে না— কোথাও কোনো কবরস্থানে গৃহায়ণ পরিকল্পনার মতো, কোথাও হয়তো তার সংখ্যায় মিলে না অথবা কোনো মেডিক্যাল স্কুলে পেশী আর স্নায়ুর চাপে পড়ে আছে, খোদা জানেন। এই পৃথিবীতে আর তার কোনো পরিচিতি নেই (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৬৭)।

ভাইয়ের মরদেহ না পেয়ে পেট্রাস মরদেহ প্রাপ্তির জন্য প্রদেয় টাকাটা ফেরত পাওয়ার জন্য আবেদন করেছিল কিন্তু শ্বেতাঙ্গ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গড়িমসি করে টাকাটা আর দেয় নি। সাংবিধানিক বর্ণবাদী বাস্তবতায় এটাই ছিল কৃষ্ণাঙ্গদের জীবনের চিত্র।

গল্পটিতে শ্বেতাঙ্গ কথকের মানসিকতাও লক্ষযোগ্য। এটা ঠিক যে, সে পুরো ঘটনাটা অনুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করেছে। আর এই বর্ণনা খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, সে কাজ করেছে কিন্তু অনিচ্ছা ও বিরক্তির সাথে। পেট্রাসের ভাইয়ের মৃত্যুর সংবাদটা যখন তার স্ত্রী লেরিস তাকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানাতে অনুরোধ করেছে তখন তার প্রতিক্রিয়া, "এখন এসব আজে-বাজে কাজ করার একমাত্র ব্যক্তি হলাম আমি" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৬০)।

—এখানে লক্ষণীয় একজন শ্বেতাঙ্গ মালিকের দৃষ্টিতে একজন কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকের মৃত্যুর সংবাদ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানানোর কাজটি হলো 'আজে-বাজে' কাজ। আবার যখন পেট্রাসের ভাইয়ের প্রকৃত মরদেহ পাওয়ার জন্য তাকে হাসপাতালে ঘুরতে হচ্ছে তখন স্ত্রী লেরিসের

কাছে তার প্রতিক্রিয়া, "আমার অফিসের অর্ধেক সময় নষ্ট হচ্ছে পেট্রাসের ব্যাপারে শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত গাড়ি নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৬৬)।

গল্পকার গল্পটি শেষ করেছেন 'গরুর বিনিময়ে জুতো'র মতো একটি বিদ্রুপাত্মক চিত্র রূপায়ণের মধ্য দিয়ে। আমরা দেখি, কথকের স্ত্রী লেরিস পেট্রাসের বৃদ্ধ বাবাকে বিদায় দিচ্ছে কয়েকটা পুরোনো জামাকাপড় দিয়ে। বৃদ্ধ লোকটা রোডেশিয়া থেকে পায়ে হেঁটে দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিল ছেলের মৃতদেহটিকে দেখতে ও সৎকার করতে। কিন্তু সে ছেলের মরদেহও পায়নি সৎকারও করতে পারেনি। বরং পেয়েছে কিছু পুরোনো জামাকাপড়। ছেলের মরদেহের পরিবর্তে পুরোনো জামাকাপড়। শ্বেতাঙ্গ কথকের দৃষ্টিতে এটা বেশ ভালো কারণ বাইরে প্রচণ্ড শীত। কথকের ভাষায়, "লেরিস বৃদ্ধ লোকটাকে তার বাবার কয়েকটা পুরোনো জামা-কাপড় দিয়ে দিল। লোকটা যে রকম কাঙাল অবস্থায় এসেছিল তার চেয়ে ভালো অবস্থায় রোডেশিয়া ফিরে গেল– বেশ তো একপ্রস্থ গরম কাপড়– বাইরে যখন এমন প্রচণ্ড শীত" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৬৭)। শ্বেতাঙ্গের কাছে কৃষ্ণাঙ্গের জীবনের চেয়ে শীতকালে একপ্রস্থ গরম কাপড়ের মূল্য ও গুরুত্ব অনেক বেশি। এভাবেই শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবাদী বর্বরতায় বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত কৃষ্ণাঙ্গদের করুণ ও মানবেতর জীবনচিত্র রূপায়ণ করেছেন গল্পকার এই গল্পে।

আধুনিক সভ্যতা ও মানবতার ধ্বজাধারী ফরাসি কলোনাইজারদের বর্ণবাদী আচরণের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে ক্যামেরুনের কথাসাহিত্যিক ফার্দিনান্দ ওইনো[১৯] (Ferdinand Oyono) রচিত 'পদক'[২০] গল্পে। উপনিবেশের রূঢ় বাস্তবতায় শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবাদী আচরণে কৃষ্ণাঙ্গদের মনে সৃষ্ট জটিল প্রতিক্রিয়ার রূপায়ণও এই গল্পের অনন্য একটি দিক। গল্পটি রচিত হয়েছে একটি পদক প্রদান অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠান পরবর্তী সময়ে সংঘটিত বর্ণবাদী আচরণকে কেন্দ্র করে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মেকা। ফ্রান্স থেকে আসা খ্রিষ্টান মিশনারিদের জন্য সে জমি দান করেছিল এবং নিজের দুই ছেলেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পাঠিয়েছিল ফরাসিদের পক্ষ হয়ে জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। সে হচ্ছে সেই বিখ্যাত মেকার বংশধর যিনি "সাদারা যখন প্রথম আসে তখন বহুদিন ধরে তাদের প্রতিরোধ করেছিলো" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩১৮)। সে একজন বয়স্ক কৃষ্ণাঙ্গ। তাকে এবং মি. পিপিনিয়াকিস নামক আরেক গ্রিক শ্বেতাঙ্গকে পদক দেওয়া হবে এই অনুষ্ঠানে। একারণে তাকে মাঠে চুন দিয়ে তৈরি বৃত্তের মাঝে রোদের ভিতরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে আর মি. পিপিনিয়াকিস বসে আছেন ছায়ায়। মি. পিপিনিয়াকিসকে সৈন্যরা সম্মান দেয় কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ বলে সৈন্যরা মেকা-কে সম্মান দেয় না। অথচ "সাদা আদমি যখন পাশ দিয়ে হেঁটে যায় তখন সে দেখেছে সৈন্যরা খটাখট পায়ের গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়ায়" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩১৭)।

পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে বুট পায়ে দিয়ে খোলা মাঠে দুপুরের রোদে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে চুন দিয়ে তৈরি বৃত্তের মাঝে দাঁড়িয়ে থেকে ঘামে ভিজে মেকা একাকার, তার ওপর প্রস্রাবের প্রবল চাপ। তার মনে সংশয় দেখা দিয়েছে যে, সূর্যটা কি আসমানে নাকি তার পিঠের ওপরে। অথচ সামনেই ছায়ার নিচে সাদা পোশাক পরে বেশ আরামেই বসে আছে ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গরা। এটা দেখে নিজের প্রতি তার আক্ষেপ "হায়, ওদের কী ভাগ্য, এরকম আগুনে জুতো পায়ে কষ্ট করতে হচ্ছে না।... আর শালা, আমি একজন বয়স্ক লোক এই রোদের মধ্যে খাড়া দাঁড়িয়ে উনোনে ডিমের মতো আমার মাথাটা ভাজনা করছি" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩২০)। এমতাবস্থায় ঈশ্বরের প্রতি তার বিনীত প্রার্থনা,

> হা ঈশ্বর, তুমিই কেবল জানো মানুষের অন্তরে কি আছে। তুমি জানো এই মুহূর্তে আমি তকমা পাওয়ার খায়েশে অপেক্ষা করছি কখন সাদাদের বড়লাট আসবেন এই চুনের দাগের পাশে দুই জাহানের মধ্যে,... দুই জাহানের মাঝে, ঈশ্বর, তুমি সম্পূর্ণ আলাদাভাবে তৈরি করেছে (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩২০)।

–ঈশ্বরের প্রতি ব্যক্ত মেকার এই মনোভাবের মধ্য দিয়ে বর্ণবাদের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। এখানে দুই জাহান বলতে যেমন ইউরোপ ও আফ্রিকা নির্দেশ করা যায়, ঠিক তেমনি শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গদেরকেও নির্দেশ করা যায়।

মেকা'র দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর বড়লাট-এর আগমন ঘটে। বিউগলে সুর বেজে ওঠে। সবাই তটস্থ হয়। তিন রঙা পতাকা উড়িয়ে একটা কালো গাড়িতে চড়ে বড়লাট অনুষ্ঠান স্থলে এসে পৌছান। গার্ড অব অনার শেষ হয়। দু'একজন এসে মেকা'র সাথে হাত মিলিয়ে ইউরোপীয়দের দিকে চলে যায় কিন্তু পদক সত্বরই আসে না। পুরো একটি ঘণ্টা রোদে দাঁড়িয়ে থাকার পরেও যখন সবাই কেবল হাত মিলিয়ে চলে যায়, তখন মেকা ভাবে, পদক দিতে ওরা এত দেরি করছে কেন? ওরা কি পদকটা হারিয়ে ফেলেছে? নাকি ভুলেই গেছে পদক দেওয়ার কথা? এমন সময় ইউরোপীয়দের সম্বন্ধে মেকার মনের যে ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে কলোনাইজার ফরাসিদের দ্বিচারী মানসিকতার কথা :

> এদের হাত দিয়ে কিছুই সহজে পার হয় না। হাঁটার সময় তো মনে হয় দৌড়ায়, অথচ ওয়াদা করা একটা কাজ করতে এখন কেমন গড়িমসি করছে। এখন আবার চত্বরের ঐ প্রান্ত দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে তাদের অন্তহীন পরিচয় আর অভিনন্দনের পর্ব চলছে (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩২২)।

দীর্ঘক্ষণ দুপুরের রোদে পায়ে ব্যথা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কষ্ট তার লাঘব হয়। মি. ফাউকোনি ও তার ডেপুটি এবং মি. পিপিনিয়াকিস তার দিকে এগিয়ে আসে। মি. পিপিনিয়াকিস তার পাশে এসে দাঁড়ায়। সে দেখে যে থুতনির নিচে টাই পরিহিত প্রকাণ্ড ঝুলন্ত কম্বল বিশিষ্ট অতিশ্বেতকায় একজন তাদের দিকে এগিয়ে আসে এবং থামে মি. পিপিনিয়াকিস এর নিকটে। সে ভাবে যে এই লোকটিই সম্ভবত 'বড়লাট'। অতিশ্বেতকায় লোকটি মি. পিপিনিয়াকিস এর সামনে দাঁড়িয়ে অতিউচ্চস্বরে চেঁচিয়ে কিছু কথা বলে এবং পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ডেপুটির হাতে থাকা বক্স হতে একটি মেডেল বার করে মি. পিপিনিয়াকিস এর বুকে সেঁটে দেয়; অতঃপর মি. পিপিনিয়াকিস এর কাঁধ ধরে তার গালে গাল ঠেকায়।

এরপর অতিশ্বেতকায় লোকটি মেকার কাছে এসে দাঁড়ায় এবং পূর্বেকার মতো চেঁচিয়ে কিছু একটা বলে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ডেপুটির হাতে রাখা বক্স হতে আরেকটি মেডেল বের করে মেকার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার বুকে সেটা সেঁটে দেয়। মেকা লক্ষ করে তার মেডেলটা মি. পিপিনিয়াকিস এর মেডেলটার মতো নয়, যদিও তারা একই অবদানের জন্য মেডেল পাচ্ছে। মেকা ভেবেছিল শ্বেতকায় লোকটি সম্ভবত পূর্বের জনের মতো তারও কাঁধে কাঁধ ঠেকাবে। কিন্তু সে লক্ষ করল বড়লাট কাঁধে কাঁধ ঠেকানোর পরিবর্তে মেডেলটা পরিয়ে দিয়ে দু'কদম পিছিয়ে গিয়ে হ্যান্ডসেক করার জন্য তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। লেখকের ভাষায়–

> তিনি ছোট বাক্স থেকে আরেকটা মেডেল তুলে নিয়ে মেকার দিকে কথা বলতে বলতে এগিয়ে যান। মেকা লক্ষ করে এই মেডেলটা গ্রীকেরটার মতো নয়।... উদ্বেগ নিয়ে মেকা ভাবে সাহেব কি মি. পিপিনিয়াকিসের বেলায় যেমন তাঁর ভেজা কম্বল কাঁধে ঠেকিয়েছেন, তেমনি তার কাঁধেও ঠেকাবেন? কিন্তু বড়লাট যখন মেডেল পরিয়ে দু'কদম পিছিয়ে গিয়ে তার দিকে হাত বাড়ান তখন– মেকা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩২৩)।

এখানে লক্ষণীয় যে, মি. পিপিনিয়াকিস হলেন একজন গ্রিক শ্বেতাঙ্গ। তাই বড়লাট তার কাঁধে ও গালে নিজের কাঁধ ও গাল ঠেকালেন এবং বড় মেডেলটা দিলেন। আর মেকা কৃষ্ণাঙ্গ বলে তাকে দিলেন ছোট মেডেলটা এবং মেকার কাঁধ ও গালে নিজের কাঁধ ও গাল মেলানোর পরিবর্তে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে কেবল হাত বাড়িয়ে দিলের হ্যান্ডসেক করার জন্য। অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গদের দৃষ্টিতে কৃষ্ণাঙ্গরা এতটাই অস্পৃশ্য যে, তাদের সাথে খুব বেশি হলে হ্যান্ডসেক করা যেতে পারে কিন্তু কোনোভাবেই তাদের সাথে গাল কিংবা কাঁধ মেলানো যেতে পারে না। আরও লক্ষণীয় যে, মেডেল পাচ্ছে দু'জনই। কিন্তু একই রকম কষ্ট দু'জনকে করতে হচ্ছে না। মি. পিপিনিয়াকিস রোদে না পুড়ে ছায়ায় আরামে বসে থেকে শেষ মুহূর্তে বড়লাট আসার আগে মাঠে এসে দাঁড়িয়ে বড় মেডেলটি পাচ্ছেন আর মেকা-কে ব্যথা পায়ে বুট পরিধান করে কয়েক ঘণ্টা ধরে দুপুরের রোদে প্রস্রাবের চাপ সহ্য করে দাঁড়িয়ে থেকে ছোট মেডেলটি পেতে হচ্ছে। তার কারণ সে কৃষ্ণাঙ্গ, কালা আদমি। বর্ণবাদীদের ফরাসিদের দৃষ্টিতে, কালোরা কখনোই সাদাদের সমান মর্যাদাপূর্ণ মেডেল পেতে পারে না, কিংবা তারা তা পাওয়ার যোগ্যও না।

গল্পের শেষ অংশে এসে আমরা শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবাদী মানসিকতার চূড়ান্ত স্বরূপ দেখতে পাই। মেডেল পাওয়ার আনন্দে ঐদিন রাতে মেকা তার স্বজাতির লোকদের সাথে মিলে প্রচুর শ্যাম্পেন পান করে। রাতে ফেরার পথে সে নেশার ঘোরে ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত এলাকায় ঢুকে পড়ে। তখন তার কছে পরিচয়পত্র স্বরূপ 'পাশ' ছিল না; ছিল শুধু বড়লাটের কাছ থেকে পাওয়া মেডেলটা। সে প্রহরীদের মেডেলটা দেখায় কিন্তু প্রহরীরা তা বিশ্বাস করেনা। একপর্যায়ে তারা মেকা-কে বন্দি করে নিকৃষ্টভাবে গালাগালি করে এবং শারীরিকভাবে প্রচুর প্রহার করে। তারা তার বিরুদ্ধে ইউরাপীয়দের এলাকায় লুটপাটের অভিযোগ আনে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে উন্মাদ আখ্যা দিয়ে ছেড়ে দেয়। শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে সে বাড়ি ফিরে আসে এবং ভারসাম্যহীনের মতো প্রলাপ বকতে থাকে এই বলে যে, এই সাদারা আমাকে শেষ করে ফেলেছে।

গল্পটি বর্ণবাদী আচরণের নির্মম শিকার মেকা নামক এক কৃষ্ণাঙ্গ বৃদ্ধের, যে তার ঔপনিবেশিক প্রভুর প্রতি অনুগত ছিল কিন্তু ঐ প্রভুদের দ্বারাই প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

আট

আফ্রিকায় ইউরোপীয়দের আগমনের অনেক আগে থেকেই দাসব্যবসা চালু ছিল। তবে সেই দাসব্যবসা এবং আফ্রিকা থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের ধরে নিয়ে ইউরোপ-আমেরিকায় দাসত্বে নিয়োগ করার মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে। যেমন ইউরোপীয় কর্তৃক দাস ব্যবসা শুরু হওয়ার আগে, আফ্রিকার দেশে দেশে গোত্রে গোত্রে সংঘটিত যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দি হওয়া কৃষ্ণাঙ্গরা যখন দাসে পরিণত হতো তখন তাদের প্রতি কোনো বর্ণবাদী আচরণ করা হতো না। বিজয়ী গোত্রের বা দেশের লোকেরা বন্দিদের নিম্নস্তরের জীব বলেও মনে করতো না। বন্দি ব্যক্তি

দাসত্বকে বরণ করে নিয়ে ক্রমেই নিজ যোগ্যতা বলে মনিবের পরিবারের একজন বলে পরিগণিত হতে পারতো, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে সে মনিবের সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও হতো। সেকালের আফ্রিকায় সামাজিকভাবে ক্রীতদাস এবং মনিবের সন্তানদের মধ্যে কোনো বৈষম্য ছিল না। পুরুষ ক্রীতদাস মনিবের পরিবারেই বিয়ে-শাদি করে সম্পত্তির এমনকি পরিবারেরও মালিক হতে পারতো। প্রক্রিয়াটা ছিল এমন যে, যুদ্ধবন্দি প্রথমে হতো দাস, অতঃপর দাস হতে মুক্তমানুষ এবং শেষে মুক্তমানুষ থেকে গোত্রপতি। এ থেকেই ইউরোপীয়দের আগমন পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ের দাসব্যবসার পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপনিবেশ পূর্ববর্তী সময়ে ক্রীতদাসেরা এক পর্যায়ে মুক্ত হয়ে মানবিক জীবনযাপন করতে পারতো, আর পরবর্তী পর্যায়ে এসে তারা সমস্ত মানবিক অধিকার হারিয়ে পরিণত হলো কেবলই পণ্যে। সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদের মতে, "সপ্তম শতক থেকে অভিযান চালিয়ে অষ্টম শতকের শুরুতে আফ্রিকার উত্তরাংশ দখল করে নেয় মুসলিম রাজশক্তি। আরব ও পারস্যের সিরাজীরা আফ্রিকার পূর্ব উপকূল দখল করে এবং দাস ব্যবসা শুরু করে" (শাহেদ, ২০১২ : ১৪)। তিনি আরও বলেন,

> ষোল শতকের দিকে আফ্রিকার বৃহদাংশ ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রায় একই সময়ে প্রসার লাভ করে আন্তঃঅতলান্তিক দাস ব্যবসা। পরবর্তী চারশ বছরে আরব পৃষ্ঠপোষকতাতেই এক কোটির বেশি মানুষকে দাস করে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যারিবীয় অঞ্চল, উত্তর ও লাতিন আমেরিকায় (শাহেদ, ২০১২ : ১৪)।

পনেরো শতকে (১৪৯২ সালে) ইতালির নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বস (১৪৫১-১৫০৬) কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হলে ইউরোপীয়দের সামনে উন্মোচিত হয়ে যায় আমেরিকা মহাদেশের বিপুল ভূভাগ। কলম্বস একদিকে আমেরিকা মহাদেশের আবিষ্কারক অপরদিকে ট্রান্সআটলান্টিক দাসব্যবসার প্রতিষ্ঠাতা। এসময় সমুদ্র পথে জাহাজ ডাকাতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ দিয়ে ইউরোপীয়রা আফ্রিকায় পশ্চিমা ঘরানার দাসব্যবসা আরম্ভ করে। খলিকুজ্জামান ইলিয়াস এর মতে,

> এ সময় তারা খুব সহজ শর্তে আফ্রিকার রাজা, গোত্রপতি এবং দাসব্যবসায়ীদের সঙ্গে ব্যবসায় নামল। প্রধানত তিন উপায়ে তারা দাস সংগ্রহ করে: চুরি-ডাকাতি করে, যুদ্ধের শর্ত হিসেবে এবং রাজা-রাজড়াদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার মাধ্যমে। সত্যি বলতে এই শেষোক্ত প্রক্রিয়াটিই দাসব্যবসাকে শক্ত পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে। ওরা আফ্রিকার রাজাদের দিত ঘোড়া, বন্দুক, মদের বোতল। এইসব দ্রব্য ছিল আফ্রিকার রাজাদের অত্যন্ত প্রিয় (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ১৬৯)।

এর ফল হিসেবে দেখা যায় যে, কামান-বন্দুক পেয়ে রাজারা নিজেদের শক্তি অনেকগুণ বৃদ্ধি করে ফেললো এবং পার্শ্ববর্তী দুর্বল রাজ্যগুলোকে আক্রমণ ও পরাজিত করে বন্দিদেরকে ইউরোপীয়দের কাছে দাস হিসেবে বিক্রি করা শুরু করলো। পরিস্থিতি এমন আকার ধারণ করলো যে, অনেক স্থানীয় রাজাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও টিকে থাকার স্বার্থে বাধ্য হতে হলো ইউরোপীয়দের সাথে দাস ব্যবসায় যোগ দিতে। আর এভাবেই আফ্রিকার গোত্রপতিরা এক দারুণ ষড়যন্ত্রমূলক চক্রে নিপতিত হলো এবং এর সুফল লাভ করতে থাকলো ইউরোপীয় দাসব্যবসায়ীরা।

ষোলো শতকে ইউরোপের ক্ষমতাবান ব্যবসায়ীরা দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে শুরু করে কফি, তুলা, তামাক ও আখের চাষ। এই চাষের জন্য তাদের দরকার পড়ে বিপুল সংখ্যক কৃষি শ্রমিকের এবং কৃষি শ্রমিকের এই অভাব পূরণ করার জন্যই বিস্তৃতি লাভ করে দাসব্যবসা। দাস হিসেবে যাদের কেনা-বেচা করা হতো, তারা ছিল আফ্রিকা থেকে ধরে আনা– ক্ষেত্র বিশেষে কিনে আনা– লক্ষ লক্ষ কালো মানুষ। মূলত আফ্রিকা থেকে আনা বিপুল সংখ্যক কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকেই দাস বানিয়ে নিযুক্ত করা হয় কৃষিকাজে। আফ্রিকায় পশ্চিমা ধারার দাসব্যবসা শুরু করে পর্তুগিজরা পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ষোলো শতকের শুরুর দিকে ক্যারিবীয় অঞ্চলে দাস সরবরাহ শুরু করে ব্রিটিশ ও আমেরিকান দাসব্যবসায়ীরা। ষোল শতকে ট্রান্সআটলান্টিক দাস ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতো পর্তুগিজরা, সতের শতকে ডাচরা আর আঠারো শতকে ব্রিটিশরা। এই সময়ে আটলান্টিকের দুই পাড়ে দাসব্যবসা অত্যন্ত জমজমাট হয়ে ওঠে। দাসব্যবসাকে কেন্দ্র করে আফ্রিকার উপকূলে গড়ে উঠেছিল বন্দর, কারখানা ও দুর্গ। আফ্রিকার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের ধরে এনে দাস হিসেবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে আমেরিকায় সরবরাহের জন্য আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে চল্লিশটার মতো দাসদুর্গ (Slave Fort) নির্মাণ করা হয়েছিল। পনের থেকে ষোল শতক, এই দুশো বছরে আফ্রিকা থেকে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় দাস হিসেবে বিক্রির জন্য আনা হয়েছিল। ১৮০৭ সালে দাসব্যবসা বন্ধ করা হয়। ক্যারিবীয় অঞ্চলে দাসপ্রথা বাতিল হয় ১৮৩৩ সালে আর আমেরিকায় ১৮৬৩ সালে। ক্যারিবীয় অঞ্চলে কৃষ্ণাঙ্গদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় এরা আফ্রিকাভিত্তিক একটি সংস্কৃতি সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক আক্রমণ থেকে এরা যেমন নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছিল তেমনি নিজেদের সংস্কৃতির লালন করতেও সক্ষম হলো। কিন্তু উত্তর আমেরিকায় বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য দাসপ্রথার বিলুপ্তি ছিলো আসলে শ্বেতাঙ্গদের শোষণ-অত্যাচার থেকে মুক্তি নয় বরং নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে শোষণ-অত্যাচারের প্রচলন। এই ব্যবস্থায় কৃষ্ণাঙ্গরা প্রাক-ঔপনিবেশিক দাস অবস্থা থেকে মুক্ত হলেও নতুন করে নিপতিত হলো পুঁজিবাদী নয়া ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার মধ্যে। এই অবস্থায় দাসপ্রথার অবসান হলো বটে কিন্তু টিকে রইল বর্ণবাদ– শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গদের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের দৃশ্যমান অবসান ঘটলো ১৯৯১ সালের মাঝামাঝি সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় সাংবিধানিক বর্ণবাদের বিলুপ্তি ঘোষণার মধ্য দিয়ে। আফ্রিকার এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের কৃষ্ণাঙ্গরা মৌলিক মানবাধিকার ফিরে পেল; পেল মুক্তির স্বাদ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে সর্বত্রই শ্বেতাঙ্গরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার কারণে কৃষ্ণাঙ্গদের ওপরে নিপীড়ন অব্যাহত রইল। "দাস হিসেবে, কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবে এবং সংখ্যালঘু হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের আফ্রিকান-আমেরিকানরা বাস্তবিকই আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক নিপীড়নের শিকার" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ১৭২)।

অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে ইউরোপে বিশেষত ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব শুরুর হলে দাসব্যবসা ঝিমিয়ে পড়ে। এসময়ে ইউরোপীয়রা দাসব্যবসার পরিবর্তে শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহ ও সরবরাহ এবং শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সন্ধান ও তা দখলে জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। আগে যে এলাকাগুলোতে তারা দাসব্যবসা করতো, এখন তারা সেগুলো অস্ত্রের বলে দখল করে নেয়। আর এই দখলকে জায়েজ করার জন্য তারা এই বুলি আওড়াতে থাকে যে, আফ্রিকা অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ। তার দরকার সভ্যতা, ভাষা, ধর্ম ও শিক্ষার আলো। দক্ষিণ আফ্রিকার ধর্মযাজক ডেসমন্ড টুটু বিষয়টিকে শ্লেষাত্মকভাবে সুন্দর করে উপস্থাপন করেছেন এভাবে–

> সাদা চামড়ার দেবতাতুল্য লোকগুলো যখন এল, তখন তাদের হাতে ছিল বাইবেল, আর কালো মানুষদের অর্থাৎ আমাদের হাতে ছিল আমাদের মৃত্তিকা, জমি। ওরা বলল চোখ বন্ধ কর, ঈশ্বরকে ভাব, ধ্যানস্থ হও। আমরা বন্ধ করলাম আমাদের চোখ। তারপর চোখ খুলে দেখি ওদের হাতে আমাদের ভূমি, আর আমাদের হাতে শুধুই একখানা বাইবেল (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ১৩-১৪)।

আর সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ বলেছেন এভাবে–

> শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীরা যখন প্রথম মানবসভ্যতার প্রাচীন-ভূমি আফ্রিকায় গেল, তাদের হাতে ছিল যিশুর বাণী বাইবেল। ক্রমশঃ তারা আফ্রিকার রাজদণ্ড তুলে নিল হাতে; আর আফ্রিকাবাসীর হাতে তুলে দিল বাইবেল। রাজদণ্ডের সাঙ্গে সঙ্গে নিল সমগ্র ভূখণ্ড; উপহার দিল জীর্ণ আবাস, ভগ্ন-স্বাস্থ্য আর কোনমতে বেঁচে থাকার মতো কয়েকটি মুদ্রা (শাহেদ, ২০১২ : ২২)।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ইউরোপীয়দের এই মিথ্যাচারের কারণ কী? এর উত্তর খলিকুজ্জামান ইলিয়াস দিয়েছেন এভাবে– "উপনিবেশকে যৌক্তিক করার এবং নিজেদের বিবেকের কাছে জবাবদিহি করার জন্যেই আফ্রিকার মুখে এই কালিমালেপন" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ১৬৯–৭০)। আসলে দাসব্যবসার পেছনে অর্থনৈতিক কারণই ছিল প্রধান। কিন্তু দাসব্যবসাকে বা দাসপ্রথাকে যৌক্তিক ভিত্তিতে দাঁড় করাতে গিয়েই শ্বেতাঙ্গদেরকে আশ্রয় নিতে হলো বর্ণবাদের। তাদেরকে এই বুলি আওড়াতে হলো যে, কৃষ্ণাঙ্গরা নিম্নশ্রেণির ইতর মানুষ। তারা আজীবন দাস হয়েই থাকবে; শ্বেতাঙ্গদের সকল কাজ করবে; তাদের সন্তানেরাও জন্মাবে দাস হয়ে; তারা আসলে কালোজাত। এ কারণে বলা যায়, বর্ণবাদ দাসপ্রথার অবিচ্ছেদ্য অংশ যা একেবারে শ্বেতাঙ্গদের আর্থিক এবং নৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করেছে।

শিবনারায়ণ রায় বলেছেন, "যে আপনাকে জানার চেষ্টা করে না, আসলে সে কিছুই জানার চেষ্টা করে না" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ১৩)। –আপনাকে জানার যে চেষ্টা, সেই চেষ্টা ও অনুসন্ধিৎসার ভিতর দিয়ে দাসব্যবসায়ের চিত্র রূপায়ণ করেছেন সেমবেনে ওসমান[১৩] (Semmbene Ousmane) তাঁর 'উপজাতির ক্ষতচিহ্ন অথবা ভোলতেইকরা'[১৪] গল্পে। গল্পের মাঝে গল্প বলার ছলে গল্পটিতে একদিকে যেমন রূপায়িত হয়েছে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের তীব্র মর্মবেদনা, অপরদিকে প্রকাশিত হয়েছে আত্ম-আবিষ্কার, আত্মানুসন্ধান এবং পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য ও শেকড় সন্ধানের চেষ্টা, ঔপনিবেশিক ক্ষতের গভীরতা, ভয়াবহতা এবং পরিত্রাণের বিশল্যকরণী আবিষ্কারের চিত্র। সমীরণ গুহ মজুমদার এর মতে, "কথনভঙ্গির এই বৈশিষ্ট্য আফ্রিকার গল্প বলার ঐতিহ্য অনুসারী" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ২০৮)। গল্পটি শুরু হয়েছে সেয়ার নামক ঠান্ডা মাথার ও গম্ভীর স্বভাবের এক ব্যক্তির আত্মানুসন্ধানমূলক এক প্রশ্ন উপস্থাপনের ভিতর দিয়ে আর তা হলো :"আমাদের জাতের লোকের গায়ে ও-রকম জখমের দাগ থাকে কেন" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩০৩)? এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের জন্য ভোলতেইক গোত্রের লোকেরা পার্শ্ববর্তী গ্রামের মুরুব্বিদের কাছে যেত; যাদেরকে তারা 'জ্যান্ত বিশ্বকোষ' বলে মনে করত। "তারা যেত শুধু এই রহস্যটার গভীরে তলিয়ে দেখবার জন্য– কেননা এটা মনে হচ্ছিল যে এই ক্ষতচিহ্নের ব্যাপারটা কোনো সুদূর অতীতে প্রোথিত হয়ে আছে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩০৩)। প্রশ্নের উত্তর হিসেবে তারা বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা পেয়েছিল। কেউ বলেছিল "'এটা হলো বংশ গরিমার চিহ্ন'; কেউ বলেছিল 'এটা

দাসত্বের প্রতীক'; আবার কেউ কেউ বলেছিল 'এটা নিছকই একটা শোভার চিহ্ন'"(শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩০৩)।

তবে এই সকল ব্যাখ্যাই ছিলো ভুল। আধা ভোলতেইক, আধা সেনেগালি সেয়ার অন্তত তা-ই ব্যাখ্যা করে সবাইকে বুঝিয়ে বলে। সে বলে আধুনিক যুগে যারা দাসব্যবসা ও ক্রীতদাস প্রথা নিয়ে ভালো কাজ করেছে, তাদের লেখায় এই ক্ষত চিহ্নের উদ্ভবের বিষয়ে তেমন কোনো বিশ্বস্ত তথ্য পাওয়া যাবে না। আবার আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের একটা অংশ যারা শুরুতে ক্রীতদাস হিসেবে লাতিন আমেরিকায় কিংবা ক্যারিবীয় অঞ্চলে গেছে, তাদের শরীরেও এধরনের ক্ষত চিহ্ন বা দাগ পাওয়া যাবে না। তাঁর দৃষ্টিতে, এর উত্তর পেতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে "দাস ব্যবসার আগেকার কালো আফ্রিকায়– সেই প্রাচীন ঘানা সাম্রাজ্য, মালি আর গাও সাম্রাজ্যের আমলে– হাউসা, বেনিন, মসি ইত্যাদি নগর ও রাজত্বের সময়ে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩০৫)। এরপর সে বলে, "আমরা যদি তন্ময়ভাবে দাস ব্যবসার ইতিহাস পরীক্ষা করি, তাহলে দেখতে পাব যে, ব্যবসায়ীরা সেই কালোদেরই সন্ধান করত যারা শক্ত-সমর্থ, স্বাস্থ্যবান ও নিখুঁত গড়ন" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩০৫)। সেয়ারের মুখ থেকে এসব কথা কোনোর পর শ্রোতারা ক্ষত চিহ্নের উদ্ভবের কাহিনি শুনতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তাদের আবেদনের মধ্যে সে আগ্রহের ছাপ স্পষ্ট: "'বলো, সেয়ার, তুমিই আমাদের বলো,' আমরা বলে উঠলুম, জাতীয় ক্ষতচিহ্নের উদ্ভব বিষয়ে তার কাহিনী শোনবার জন্য এখন আমরা আরো উদগ্রীব হয়ে উঠেছি" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩০৫)।

অতঃপর সেয়ার একটি কাহিনি বলে, যে কাহিনির ভিতর দিয়ে রূপায়িত হয়েছে দাস ব্যবসার ইতিবৃত্ত। কাহিনির শুরুতে আমরা পাই 'আফ্রিকান' নামক একটি জাহাজের বর্ণনা, যে জাহাজে করে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষগুলোকে দাস হিসেবে বিক্রির জন্য প্রেরণ করা হতো আমেরিকায়। সেই জাহাজটি খোল ভরা হয়েছে পঞ্চাশজন কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ ও ত্রিশজন কৃষ্ণাঙ্গ নারীকে দিয়ে। জাহাজটি উপসাগরে বেশ কয়েকদিন ধরে নোঙরবন্দি হয়ে আছে, কারণ জাহাজটির খোল এখনো দাসদের দ্বারা পূর্ণ হয়নি। তাই ক্যাপ্টেনের দালালরা কৃষ্ণাঙ্গদের ধরার জন্য সারাদেশ তন্নতন্ন করে খুঁজছে। জাহাজের ডাক্তার ও কয়েকজন খালাসি মিলে কথাবার্তা বলছে, এমন সময় জাহাজে আক্রমণ করে মোমতু, আমু ও তাদের চার সশস্ত্র অনুসারী। তারা জাহাজের পিপেনির্মাতা, খালাসি ও ক্যাপ্টেনকে হত্যা করে এবং বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জাহাজটিকে ডুবিয়ে দেয়। মোমতু ও তার অনুসারীরা জাহাজ লুট করে কৃষ্ণাঙ্গদের উদ্ধার করে বটে, কিন্তু মুক্ত করে দেয় না। নতুন ধরনের বন্দিত্ব শুরু হয় তাদের। দল থেকে কেউ পালাতে পারবে না। যে পালাবে তার পাশের লোকটাকে কুচি-কুচি করে কাটা হবে বলে মোমতু শাসায়। এর মধ্য দিয়ে মোমতু আসলে বন্দিদের একে অন্যকে পাহারায় নিযুক্ত করে।

আক্রমণকারীদের দলপতি মোমতু। সেও কৃষ্ণাঙ্গ। সে পরিধান করে আছে একটা চওড়া পাড়ওয়ালা টুপি, নীল রঙের উর্দি আর কালো রঙের উঁচু বুটজুতো। সে শ্বেতাঙ্গ দাসব্যবসায়ীদের সহযোগী দালাল এবং তাদের ভাষাও সে ভালোই বোঝে। যেসব দুর্গ, ছাউনি বা জায়গাতে শ্বেতাঙ্গরা নিগ্রো দাসদের বন্দি করে রাখতো পূর্বে সে সেসব জায়গায় ঘুরে ঘরে দোভাষীর কাজ করতো। অপরদিকে আমু হলো সাধারণ কৃষ্ণাঙ্গ। তার আছে বলিষ্ঠ ও অনমনীয় শরীর, অসীম শক্তি আর তেজস্বী পৌরুষ। যে কোনো ধরনের কায়িক শ্রমের জন্যই সে উপযুক্ত। আমু এবং মোমতু এক সাথে থাকলেও তাদের উদ্দেশ্য ও পথ ভিন্ন। "মোমতু এই

বন্দিদের উদ্ধার করেছে শুধু তাদের আবার বিক্রি করবার জন্যে। 'আফ্রিকান' এর কাপ্তেনকে আরো ক্রীতদাসের লোভ দেখিয়ে সে-ই এই উপসাগরে নিয়ে এসেছিল" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩০৭)। মোমতুর নিজের মুখেই উচ্চারিত হয়েছে তার উদ্দেশ্যের কথা–

> আমরা তৃণভূমি তন্নতন্ন করে খুঁজি, লোকজনদের বন্দি করে নিই আর সাদাদের কাছে বিক্রি করে দিই। কয়েকজন কাপ্তেন আমায় ভালোই চেনে, কিন্তু অন্যদের আমি লোভ দেখিয়ে উপসাগরে নিয়ে আসি– আর আমার লোকজনেরা খালাসিদের ভুলিয়ে ভালিয়ে জাহাজ থেকে নামিয়ে আনে। তারপর আমরা জহাজটা লুট করি, বন্দিদের ফিরিয়ে আনি। জাহাজে কোনো সাদালোক থাকলে তাকে খতম করি (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩০৮)।

অপরদিকে আমু একজন সাধারণ কৃষ্ণাঙ্গ। শ্বেতাঙ্গরা তার পরিবারের সবাইকে একে একে ধরে দাস হিসেবে বিক্রি করেছে। এখন তারা ধরে এনেছে আমুর মেয়েকে– দাস হিসেবে বিক্রি করবে বলে। তাই আমু এসেছে তার নয়-দশ বছর বয়সী মেয়ে ইওমে-কে উদ্ধার করতে। এজন্য সে মোমতুর সাথে থেকে কাজ করছে পাকা দুই মাস ধরে। এসময়ে সে শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে দশ-বারোটি লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে। মোমতুর এক সাগরেদের সাথে কথোপকথনের সূত্রে প্রকাশিত হয়েছে তার ও তার পরিবারের সংগ্রাম করে টিকে থাকার ইতিবৃত্ত। আমুর ভাষায়– "আমি বড় হয়েছি ভয় আর বিভীষিকার মধ্যে, জাতভাইদের সঙ্গে অনবরত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পালিয়ে বেড়িয়েছি– শুধু ক্রীতদাস হতে চাই না বলে। আমাদের জাতে কোন দাস নেই, আমরা সবাই সমান" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩০৮)। মোমতুর কণ্ঠেও উচ্চারিত হয়েছে একই রকম বক্তব্য। সে বলেছে–

> আমি তো জন্মাবধি আর্তনাদ ছাড়া আর কিছু শুনিনি– উন্মাদের মতো লোকজনদের পালাতে দেখেছি, ঝোপে-ঝাড়ে-জঙ্গলে। কিন্তু তুমি জঙ্গলে গেলে– আর কোনো অজানা লোকের শিকার হয়ে মরলে; খোলামেলা থাকলে তো, তোমাকে পাকড়ে দাস হিসেবে বেচে দেওয়া হতো (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩১২)।

এমতাবস্থায় জীবন সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস হলো, "এটাই জীবন, কখনো নিরাপদ নও তুমি, পরের দিন সূর্য ওঠা দেখতে পাবে কি না, তা অব্দি তোমার জানা নেই" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩১২)। কিন্তু তাদের মনে একটা প্রশ্ন ছিল যে, এই যে নারী-পুরুষদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের কোনো কাজে লাগানো হবে? উত্তর হিসেবে তারা একবার জনরব শুনেছিল যে, "সাদারা নাকি তাদের চামড়া দিয়ে জুতো বানায়" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩১২)।

আমু মৌলিক মানবীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত একজন কৃষ্ণাঙ্গ। গাত্রবর্ণের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা বৈষম্যে সে বিশ্বাসী নয়। সে মনে করে সবাই সমান এবং প্রত্যেকেরই মুক্তভাবে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। তাই সে যেমন নিজে দাস হতে চায় না তেমনি তার পরিবার পরিজনদের মধ্যে কেউ দাস হয়ে অমানবিক জীবনযাপন করুক এটাও সে চায় না। একারণে দাসব্যবসায়ীদের কাছে নিজের স্ত্রীকে তুলে দেওয়ার পরিবর্তে সে নিজ হাতে স্ত্রীকে হত্যা করেছিল। তার বিবেচনায় দাস হয়ে মনুষ্যেতরভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মুক্ত অবস্থায় মৃত্যুও শ্রেয়। আবার মোমতু যে উদ্দেশ্যে দাসদের মুক্ত করে ও সাদাদের হত্যা করে তার সাথে আমু কর্তৃক শ্বেতাঙ্গদেরকে হত্যা ও কৃষ্ণাঙ্গদেরকে মুক্ত করার পার্থক্য রয়েছে। আমুর ভাষায়– "এটা সত্যি যে আমি মানুষ খুন করেছি,... কিন্তু সে লোকজনকে বন্দি করে ক্রীতদাস হিসেবে বেচে

দেবার জন্যে নয়। ওটা তোমার কাজ, আমার নয়। আমি আমার গাঁয়ে ফিরতে চাই" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩০৮–০৯)।

আমু গ্রামে ফিরতে চইলেও মোমতুর পরিকল্পনা ভিন্ন। সে আমুকে সঙ্গে করে বাকি সাদাদের হত্যা করতে চায়। পাশাপাশি তার আরেকটা প্রচ্ছন্ন পরিকল্পনা হলো, কার্যোদ্ধার হয়ে গেলে সে আমু ও তার মেয়েকে বন্দি করবে এবং দাস হিসেবে বিক্রি করবে।

আমু মোমতুর এই গোপন অভিলাষ বুঝতে পেরে পরেরদিন শ্বেতাঙ্গদের সাথে লড়াইয়ের সময় মোমতুর নিযুক্ত করা পাহারাদারটিকে কুপোকাত করে পলায়ন করে দক্ষিণ-পূর্বদিকে; যেদিকে তার বাড়ি। বাড়ি যাওয়ার পথে সে পাড়ি দিল ছোট-বড়ো কতোগুলো নদী আর জঙ্গল। সে প্রধানত পথ চলত মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে রাতের বেলায় যাতে তাকে কেউ দেখতে বা চিনতে না পারে কিংবা দাস-শিকারিদের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে।

তিন সপ্তাহ পরে আমু কন্যাসহ গ্রামে এসে পৌঁছালো। সে দেখলো গ্রামে কোনো সুস্থ-সবল নারী কিংবা পুরুষ নেই। দাসশিকারিরা তাদের ধরে নিয়ে গেছে। যারা আছে তারা রুগ্ন আর দুর্বল। আফ্রিকানদের কাছে একবার দাসশিকারিদের হাতে ধরা পড়ে ফিরে আসা অলৌকিক ব্যাপার এর মতো। তাই গ্রামের বুড়োরা আমুকে ডেকে পাঠালো, কারণ তারা আমুর "দুঃসাহসী কীর্তির কথা শুনতে চায়" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩১৩)।

আমুর বীরত্বের কথা শোনার পাশাপাশি এ সময় গ্রামের বৃদ্ধরা নিজেদের জীবনের যে কথাগুলো বলেছে, তার মধ্যদিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে দাসব্যবসার বিভীষিকার চিত্র। জমায়েতের মধ্যকার সবচেয়ে বুড়ো লোকটির ভাষ্য হলো : "আমি সারাজীবন ধরে– এমনকি আমার বাপের জন্মেরও আগে থেকে, ... সারা দেশ কেবলই ভয়ে-ভয়ে কাটিয়েছে কবে তারা ধরা পড়বে আর সাদাদের কাছে বিক্রি হবে। সাদারা বর্বর" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩১৩)। আরেকজন বৃদ্ধ বলেছে, "এর কি কোনো শেষ নেই? ... কেবলই দেখলাম আমার সব ছেলেপুলেকে ওরা ধরে নিয়ে গেল– আর কতবার যে এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে পালিয়ে বেড়িয়েছি, তার ইয়ত্তা নেই। জঙ্গলের মধ্যে এর চেয়ে গভীরে আর যাওয়া যাবে না... বুনো জানোয়ার আছে, অসুখ-বিসুখ আছে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩১৩)। কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদেরকে তথা দাসশিকারিদেরকে জানোয়ারের চাইতেও নিকৃষ্ট বলে মনে করতো। আরেক বৃদ্ধের উক্তিতে সে সত্য প্রকাশিত হয়েছে, "দাস শিকারিদের চেয়ে বরং বুনো জানোয়ারের মুখোমুখি পড়তে রাজি আছি" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩১৩)।

এরপর সবাই মিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বর্তমান জায়গাটা অনিরাপদ। নিরাপত্তার জন্য তাই তাদের উচিত হবে বসতি পরিবর্তন করা। সিদ্ধান্ত হয় যে আসন্ন শীতের পরে সবাই নতুন বসতিতে স্থানান্তরিত হবে। নতুন জায়গা নির্বাচনের জন্য তারা লোকও প্রেরণ করে এবং খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করতে শুরু করে। পরিবেশ পরিস্থিতি যখন কিছুটা স্থিতিশীল হতে শুরু করেছে এমনি এক দিনে আমুদের গ্রামে আবার আক্রমণ করে দাসশিকারিরা (মোমতু ও তার দলবল)। প্রাণ বাঁচাতে সবাই দৌড়ে পালাতে থাকে জঙ্গলের দিকে। আমুও তার মেয়ে ও শাশুড়িকে নিয়ে পালাতে থাকে। গোদরোগী হওয়ায় আমুর শাশুড়ি ভালো করে চলতে পারছিল না। তাদের যখন শিকারিদের হাতে ধরা পড়ার উপক্রম তখন আমুর মাথায় এক বুদ্ধি খেলে যায়। আমু জানত যে দাস শিকারিরা সুস্থ-সবল লোকদের ছাড়া ধরে না। তাই সে চট করে স্বীয়

কন্যা ইওমেকে দুই পায়ের মধ্যে চেপে ধরে হাতে থাকা ছুরি দিয়ে মেয়ের সারা শরীর কেটে দিতে থাকে এবং অভয় দিয়ে বলে, "তোমার চামড়া আর ওদের কোন কাজে লাগবে না– সাদারা তা দিয়ে আর জুতো বানাতে পারবে না" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩১৬)।

মোমতু ও তার দলবল আমুসহ গ্রামের অন্য শক্ত-সমর্থ পুরুষ ও নারীদের ধরে নিয়ে চলে যায় আর ফেলে যায় আমুর শাশুড়ি ও মেয়েকে। কিছু দিনের মধ্যেই ইওমে ভেষজ চিকিৎসার গুণে সুস্থ হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে দাসশিকারীরা আমুদের গ্রামে আসলেও ইওমেকে আর বন্দি করে না, কারণ তার শরীর ক্ষত-বিক্ষত। দাসশিকারিদের দৃষ্টিতে সে এখন মূল্যহীন। শরীরে ঐ ক্ষত চিহ্নগুলো আছে বলে তার আর এক কানাকড়িও দাম নেই। গায়ে ক্ষতচিহ্ন থাকলে দাসশিকারীরা ধরে না– এই খবর মুহূর্তে ক্রোশের পর ক্রোশ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। দুর-দূরান্ত থেকে লোক এল খবরের সত্যতা যাচাই করতে। যখন তারা খবরের সত্যতা খুঁজে পেল, তখন– "বছরের পর বছর আর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের পূর্বপুরুষদের দেহে নানা রকম ক্ষত চিহ্ন দেখা দিতে লাগল। আর এভাবেই আমাদের পূর্বপুরুষদের শরীর ক্ষত করে দাগী করে দেওয়া হলো। তারা কিছুতেই গোলাম হতে চায়নি" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩১৭)।

–এভাবেই একদিকে গ্রেপ্তার, বন্দিত্ব, নির্যাতন ও অপরদিকে ঐসব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শরীরে ক্ষতচিহ্ন করার চিত্র রূপায়ণের ভিতর দিয়ে এই গল্পে গল্পকার দাসব্যবসার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। আর কৃষ্ণাঙ্গদের গোলাম না হতে চাওয়ার মধ্য দিয়ে গল্পকার মূলত আফ্রিকীদের দৃঢ়তাকেই উচ্চকিত করেছেন, যে দৃঢ়তা তাদেরকে মানুষ হিসেবে বাঁচার অধিকার দিতে পারবে; পারবে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে উজ্জীবিত করতে।

গল্পটিতে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, কৃষ্ণাঙ্গদেরকে দাস হিসেবে বন্দি করার ক্ষেত্রে মোমতুর মতো এক শ্রেণির কৃষ্ণাঙ্গদের ভূমিকা প্রত্যক্ষভাবে শ্বেতাঙ্গদের চেয়েও বেশি। দাস ব্যবসার ইতিহাসও অন্তত তাই বলে। দাসব্যবসার ইতিহাস পাঠে আমরা দেখব যে, শ্বেতাঙ্গরা আফ্রিকার মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীদেরকে ক্ষেত্রবিশেষে রাজা কিংবা গোত্র প্রধানদেরকের অর্থ, লবণ, কাপড়, মদ, বন্দুক ও ঘোড়া দিত বিনিময়ে এরা স্বজাতি কৃষ্ণাঙ্গদের ধরিয়ে দিত দাসব্যবসায়ীদের কাছে। হাজার হাজার দাস মারা যেত ধরার সময়ে, পালানোর সময়ে কিংবা সাগরে জাহাজে থাকাকালে। পনের থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত কালপর্বে এ ধরনের "মৃতের সংখ্যা প্রায় দুই কোটি" (শাহেদ, ২০১২ : ১৫)।

ঔপনিবেশিক অধীনতা, বর্বরতা, নির্যাতনের সমান্তরালে আফ্রিকার সাহিত্যে প্রতিরোধ ও মুক্তির কথাও উঠে এসেছে বারবার। 'উপজাতির ক্ষতচিহ্ন অথবা ভোল্‌তেইকরা' গল্পটি কেবল আমাদেরকে দাস ব্যবসার চিত্রই দেখায় না। সেইসঙ্গে জাগিয়ে দিতে চায় আমাদের চৈতন্যকে। আমাদেরকে বাধ্য করে ভাবতে ও সক্রিয় হতে। অপারেশন থিয়েটারের বিচক্ষণ শল্যচিকিৎসকের মতো গল্পকার সেমবেন উসমান নিপুণভাবে চিরে চিরে বিশ্লেষণ করেছেন আফ্রিকার দাসব্যবসা সম্পর্কে পশ্চিমাদের তৈরি করা মিথকে; যে মিথ আফ্রিকীদের ঔপনিবেশিক অতীত এবং পশ্চিমাদের দাসব্যবসার সাফাই। তারা আফ্রিকার মানুষ সম্পর্কে অসংখ্য করুণ চিত্রকল্প তৈরি করেছে শুধু দাসব্যবসাকে যুক্তিযুক্ত প্রতিপন্ন করার জন্য ও পরে উপনিবেশ সৃষ্টির পক্ষে সমর্থন সৃষ্টির জন্য। এর ফলে পৃথিবীতে এক বিশেষ ধরনের সাহিত্য

ঐতিহ্য তৈরি হয়েছে আর সেইসঙ্গে তৈরি হয়েছে আফ্রিকার মানুষকে দেখার এক বিশেষভঙ্গি।

নয়

আফ্রিকার গল্পগুলোতে যে সমাজের চিত্র বিধৃত হয়েছে, সেখানে আমরা দুই ধরনের সমাজের চিত্র পাই– নগর কেন্দ্রিক আধুনিক নাগরিক ফ্লাট জীবনের চিত্র ও গ্রামকেন্দ্রিক গোত্রভিত্তিক আদিবাসী জীবনের চিত্র। নিম্নে সমন্বিতভাবে আফ্রিকার গল্পে রূপায়িত আফ্রিকার সমাজের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হলো :

আফ্রিকার নাগরিক কিংবা গ্রামীণ দৈনন্দিন জীবনের অন্যতম একটি অনুষঙ্গ মদ (Wine)। সেখানকার নাগরিক কিংবা গ্রামীণ সমাজে মদ খাওয়ার প্রচলন ছিল। আফ্রিকায় প্রাপ্ত মদ দুই ধরনের : প্রথমটি আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের নিজস্ব দেশীয় উপায়ে প্রস্তুত করা মদ অপরটি কলোনাইজারদের সরবরাহ করা ইউরোপীয় মদ। কৃষ্ণাঙ্গরা দেশীয় মদকে ঘৃণা না করলেও শ্বেতাঙ্গদের সরবরাহ করা ইউরোপীয় মদকে ঘৃণা করত। পশ্চিমা মদ সম্পর্কে আফ্রিকানদের মনোভাব বিধৃত হয়েছে সিন্দিওয়ে ম্যাগোনা[১৬] রচিত 'ওইসব নিয়ে এখন কথা হচ্ছে না'[১৭] গল্পে। একটি বৈষম্যবাদী সরকার, শিল্পপতি, পুঁজিপতি ও মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ডাকা বয়কট আন্দোলন, সংঘাত ও সংগ্রামের পটভূমিতে দক্ষিণ আফ্রিকার লাগোসের একটি পরিবারের কাহিনি অবলম্বনে গল্পটি রচিত। বয়কট আন্দোলনটি চলছে তিন সপ্তাহ ধরে। আন্দোলনকারীরা কমরেড নামে পরিচিত। তারা সাম্রাজ্যবাদী ও পুজিবাদী কলোনাইজারদের পুচ্ছধারী সরকারকে অস্বীকার করতে বদ্ধপরিকর। কমরেডদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে মদ সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি। তাদের মতে, ঐ মদ কৃষ্ণাঙ্গদের মন থেকে আফ্রিকার সত্তাকে সরিয়ে দেয়। "ও একবার যার পেটে ঢোকে আফ্রিকার মাটির গন্ধ আর তার মধ্যে থাকে না" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৩১)। মদকে তারা অভিহিত করে "আফ্রিকানদের জন্য ধরে রাখা সাদা মানুষের মুত" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৩১) বলে। তাদের কাছে পশ্চিমা মদ "সাদালোকদের কীটনাশক যা মেরে ফেলে আফ্রিকার সত্তা" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৪১)। আফ্রিকার সমাজে আনন্দ উদ্‌যাপন করার জন্য কিংবা উৎসবেও মদ পান করার প্রচলন ছিল। 'পদক' গল্পে আমরা দেখি, মেকা পদক প্রাপ্তির আনন্দ উদ্‌যাপন করার জন্য রাতে মদ পান করে ভারসাম্য হারিয়ে শ্বেতাঙ্গদের এলাকায় ঢুকে পড়ে। 'ওইসব নিয়ে এখন কথা হচ্ছে না' গল্পেও দেখা যায় বয়কটের সময়ে সাধারণ লোককে পকেটের পয়সা খরচ করে মদ কিনে খেতে এবং ম্যামভালাইনের স্বামী ল্যাংগাথিকে রাতে মদ খেয়ে মাতাল হতে। তবে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে আমরা মদের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করি 'উপজাতির ক্ষতচিহ্ন' অথবা 'ভোলতেইকরা' গল্পে। সেখানে আমরা দেখি, দেশীয় দাসশিকারিরা দাসদেরকে কয়েক পিপে মদের বিনিময়ে শ্বেতাঙ্গদের কাছে বিক্রি করতে।

আফ্রিকার বহুবিভক্ত গোত্রভিত্তিক সমাজগুলোর মধ্যে গোত্রগত ব্যবধান এবং গোত্রের মধ্যে বিয়ে করার প্রচলন বিদ্যমান। তবে গ্রামীণ সমাজে এই রীতি প্রবলভাবে প্রচল থাকলেও, শহরের শিক্ষিত জনগণের মধ্যে তা দুর্বল। বুকার পুরস্কার বিজয়ী নাইজেরীয় কথাসাহিত্যিক চিনুয়া আচেবে[১৮] (১৯৩০–২০১৩) রচিত 'পরিণয়ে নিজস্ব মত'[১৯] গল্পে আমরা দেখি, গল্পের

নায়ক নিমেকা ইবো গোত্রের লোক। সে "ইউরোপীয় ঘরানায় শিক্ষিত এবং দীক্ষিত এবং সেই কারণে নিজেদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, শেকড় ছেঁড়া" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ২০৬)। সে নিজে পছন্দ করে ভালোবেসে বিয়ে করেছে নেনে-কে, যে ইবো গোত্রের নয়। এমতাবস্থায় তাদের পরিণয়ের পারিবারিক স্বীকৃতি অনেকটাই অনিশ্চিত। নায়ক নিমেকা'র কথায় সে সংশয়ের ছাপ স্পষ্ট, "তাছাড়া আমাদের ব্যাপারটা আরো জটিল– যেহেতু তুমি ইবো গোত্রের নও" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৪২)। গল্পটিতে একটি পরিবারের শিক্ষিত সন্তানদের মধ্যদিয়ে গল্পকার তুলে ধরেছেন নাইজেরিয়ার উপনিবেশ-উত্তর সমাজের পরিবর্তন, দেশীয় মূল্যবোধ ও পাশ্চাত্য ভাবধারা তথা ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব ও আত্মপরিচয়ের সংকটকে।

আফ্রিকার গোত্রভিত্তিক সমাজগুলোতে আন্তঃগোত্রবিবাহকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিবাহের ক্ষেত্রে কনে দেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাত্রী দেখার সময় "পাত্রীর যে দুটো জিনিস দেখা হয় তা হলো– তার চরিত্র আর ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষা" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৪৪)। চিনুয়া আচেবে রচিত 'পরিণয়ে নিজস্ব মত' গল্পে নিমেকার বাবার কথায় উক্ত বিষয়টিই ফুটে উঠেছে–

> আমাদের প্রতিবেশী জ্যাকব নুয়েকির বড় মেয়ে উগর নুয়েকিকে তোমার জন্য পছন্দ করা হয়েছে। মেয়েটা তোমার জন্য চমৎকার হবে। খ্রিষ্টান ধর্মের সুন্দর আবহে সে বেড়ে উঠেছে। তার বাবা... মেয়েকে একজন প্যাস্টর এর বাড়িতে থাকতে পাঠিয়েছিলেন। ওখানে সে স্ত্রী হিসেবে যেসব গুণাবলী অর্জন করা দরকার তা করেছে।... সে বাইবেল বেশ ভালোভাবেই পড়তে পারে। (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৪৩)

বিয়ের আগে পাত্রের সাথে পাত্রীপক্ষ আলাপ-আলোচনা করত। খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা গির্জায় গিয়ে পবিত্র ক্রুশকে সাক্ষী রেখে ক্রুশের সামনে বিবাহ করত। বিবাহ অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হতো। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ছিল গিটার, ড্রাম, তাম্বুরিন, সরোদ, ঘুংগুর। বিবাহ অনুষ্ঠানে শ্বেতাঙ্গদের অনুকরণে ক্ষমতাবান কৃষ্ণাঙ্গ বর পরিধান করত স্যুট, ওয়েস্ট জ্যাকেট, হ্যাট আর কনে পরিধান করতো সাদা সাটিনের ফুলহাতা গাউন, একটি ওড়না, সাদা দস্তানা, সাদা জুতো-মোজা। বিবাহের মধ্য দিয়ে সমাজে তৈরি হত পরিবার। আফ্রিকার বিশেষত কেনিয়ার মানুষের দৃষ্টিতে আদর্শ পরিবার ও দম্পতির স্বামীটি হবে দীর্ঘাঙ্গ, টিপটপ, একটু আড়ষ্ট ও ধনাঢ্য ভূস্বামী বা ব্যবসায়ী আর স্ত্রীটি হবে আকৃতিতে ছোটখাটো, শান্তশিষ্ট, স্বামীর প্রতি অনুগত, কর্তব্যপরায়ণ, ঝামেলাবিহীন "যেন বিশালাকৃতি স্বামীর পাশে ক্ষীয়মান ছায়ার মতো" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩০৩)।

একক বিবাহের পাশাপাশি বহুবিবাহ আফ্রিকার উপজাতি ভিত্তিক সমাজের সামাজিকরীতি ও প্রথা। স্ত্রী সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সে সমাজে পুরুষের প্রতিপত্তি ও সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হতো। কোনো পুরুষের তিনটি বউ থাকলে বা কোনো পুরুষ তিনটি বিয়ে করলে সমাজ তাকে 'কাপ্তান' (Captain) উপাধিতে ভূষিত করতো। এসব কাপ্তানেরা ছিলো তাদের সমাজে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রাধান্য বিস্তারে আগ্রহী। কতগুলি নারী তার অধিকারভুক্ত এই সংখ্যা ছিলো কাপ্তানদের পৌরুষত্ব প্রমাণের এবং কাপ্তানগিরির বিজ্ঞাপন বিশেষ।

একক কিংবা বহুবিবাহের পাশাপাশি আফ্রিকার সমাজে প্রেম ছিলো; প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটত। 'ক্রুশ সকাশে বিবাহ' গল্পে আমরা দেখি প্রণয়কে পরিণতি

দানের জন্য মিরিয়ামু ওয়ারিউকির হাত ধরে পালিয়ে গেছে আর 'পরিণয়ে নিজস্ব মত' গল্পে পিতার অনুমতি ছাড়াই নিমেকা ভালোবেসে বিয়ে করেছে নেন'-কে।

আফ্রিকার গ্রামীণ জীবনে ধর্মের প্রভাব বেশ সক্রিয়। 'ক্রুশ সকাশে বিবাহ' গল্পে আমরা দেখি, মিরিয়ামুর বাবা-মা বেশ ধর্মভীরু। প্রতি রোববার তারা গির্জায় যেত। সকালে উঠে তাদের প্রথম কাজ ছিল প্রার্থনা করা। সন্ধেবেলায় এবং রাতে খাওয়ার আগে প্রার্থনা করার রীতি ছিল। তারা ছিল ভালো ক্রিশ্চিয়ান পরিবার। আবার 'পরিণয়ে নিজস্ব মত' গল্পেও দেখি, নিমেকার বাবাও বেশ ধার্মিক। সে প্রতিদিন সায়াহ্নে বাইবেল পাঠ করত। উগর নুয়েকির বাবা বাড়িতে প্যাস্টর রেখে মেয়েকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিল। 'ওইসব নিয়ে এখন কথা হচ্ছে না' গল্পেও দেখা যায়, ল্যাংগাথি-ম্যামভেলাইন দম্পতি রাত্রের প্রার্থনা শেষ করে তারপরে ঘুমাতে যেত।

নাইজেরিয়ার ইবো গোত্রের সদস্যদের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মের ও বাইবেলের প্রভাব অতি প্রবল। নিমেকা একজন স্কুল শিক্ষয়িত্রীকে বিয়ে করেছে শুনে নিমেকার পিতা ওকে-কে যা বলেছেন তাতে বাইবেলের প্রভাব স্পষ্ট– "কোনো খ্রিষ্টান মেয়ে মানুষ শিক্ষা দেয়ার কাজ করবে না। সেইন্ট পল কারিন্থিয়ানদের তার চিঠিতে লিখেছিলেন– মেয়েরা শুধু নিষ্ক্রিয় থাকবে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৪৪)। খ্রিষ্টধর্ম তথা বাইবেলের প্রভাবের কথা 'ওইসব নিয়ে এখন কথা হচ্ছে না' গল্পেও পাওয়া যায়– সেখানে আমরা দেখি, পুত্র তেতেলি বয়কট আন্দোলনে যোগ দিয়ে পিতা ল্যাংগাথি ও মাতা ম্যামভলেইনের বিরুদ্ধে চলে গেছে। তেতেলি-র মা ম্যামভালেইনের এতে উদ্বিগ্ন। সে বলেছে, "জামানা বদলে গেছে। এখনকার ছেলেদের মতো আমরা আমাদের যুগে হয়তো ভাবতে পারি নি। (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৩৮)। এর উত্তরে স্বামী ল্যাংগাথি বলেছে –"তুমি বলছ বাইবেলের মতো সত্য কথা" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৩৮)। বাইবেলের পাশাপাশি তারা পড়ত রেভারেন্ড ক্লাইভ শোমবার্গ রচিত চিরায়ত গ্রন্থ *আফ্রিকানদের নিমিত্ত ব্রিটিশ সহবৎ* (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩১৪)। আফ্রিকানদের জীবনে ধর্মের এই বিষয়টিকে না বুঝেই ইউরোপের গোষ্ঠীতাত্ত্বিকরা আফ্রিকানদেরকে 'হোমোরেলিজিয়সিস' বলে অভিহিত করতে চান। তাদের মতে, "আফ্রিকাবাসীরা হোমোরেলিজিয়সিস– তারা ধর্মকে এত বেশি গুরুত্ব দেয় বলে জীবনটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।... আফ্রিকীয়দের মানসিকগঠন এরকম বলেই বস্তুগতভাবে তারা আদিম, অনুন্নত" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ২২২)।

সন্তানেরা পিতা-মাতার কথা শুনবে, এটাই আফ্রিকার সমাজের পিতা-মাতাদের প্রত্যাশা ছিল সন্তানদের কাছে। এর ব্যত্যয় ঘটাকে তারা কেয়ামতের আলামত বলে মনে করত। কারণ বাইবেলে কেয়ামতের আলামত হিসেবে বলা হয়েছে যে, ছেলে-মেয়েরা বাবা-মায়ের কথা শুনবে না। এছাড়া বাবা-মায়ের বিরুদ্ধাচরণ কিংবা মুরব্বিদের সম্মান না করাকেও কেয়ামতের আলামত বলে মনে করা হতো। 'পরিণয়ে নিজস্ব মত' গল্পে নিমেকার বাবার সাথে গ্রামের অন্যান্য মুরুব্বিদের আলোচনায় বিষয়টি উদ্ভাসিত হয়েছে এভাবে– "আরেকজন বললেন– আমাদের প্রভু কী বলেছেন? তিনি বলেছেন– ছেলেরা বাবাদের বিরুদ্ধে যাবে– একথা আমাদের পবিত্র গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ আছে।... কেয়ামতের শুরু আরকি– আরেকজন বললেন" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৪৫)। তবে এমন ঘটলে তারা ভেঙে না পড়ে ভাবত, সন্তানের কোনো হার্বালিস্ট চিকিৎসকের চিকিৎসা দরকার।

কারণ, সম্ভবত সে অসুস্থ। নাইজেরিয়ার ইবো গোত্রে এই রোগের চিকিৎসায় পথ্য হিসেবে ব্যবহার করা হত 'এ্যামাইল'। বিপদগামী স্বামীদের ওপর এই ঔষধটি প্রয়োগ করে মেয়েরা তাকে সুপথে নিয়ে আসতে পারত। ঔষধটা তৈরির সময় যাকে খাওয়ানো হবে তার নাম উচ্চারণ করে তৈরি করতে হতো।

আফ্রিকানদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন অত্যন্ত প্রবল। পরিবার পরিজনকে উদ্ধার করার জন্য প্রাণের ঝুঁকি নিতেও পিতা কার্পণ্য করে না। 'উপজাতির ক্ষতচিহ্ন অথবা ভোলতেইকরা' গল্পে দেখা যায়, আমু তার মেয়েকে উদ্ধার করার জন্যে মোমতুর দলের সাথে মিশে জীবনবাজি রেখে শ্বেতাঙ্গদের জাহাজ আক্রমণ করেছে এবং মেয়েকে জাহাজ থেকে উদ্ধার করে এনেছে। "যাতে তার স্ত্রীকে এই দাস শিকারিরা ধরে নিয়ে যেতে না পারে সে জন্য সে নিজের হাতে তার স্ত্রীকে খুন করেছিল" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩১৫)। আবার নিজের পরিবারকে এত গভীরভাবে ভালোবাসাকে সবাই ইতিবাচকভাবে দেখত না। আমুকে লক্ষ করে মোমতুর দলের একজনের উক্তি, "লোকটা ছিটেল আছে। নিজের গ্রাম, নিজের বৌ, নিজের মেয়ে ছাড়া কিছুর কথাই ও ভাবে না" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩০৯)।

আফ্রিকার "গ্রাম মানে গোটা তিরিশ কুঁড়ে বাড়ি, একে আরেকের গায়ে জড়াজড়ি করে আছে, ঠিক জঙ্গল আর নদীর মুখটায়" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩১৩)। এর একটি কারণ নদী পাশে থাকায় সহজেই প্রয়োজনীয় জল পাওয়া যেত। অপর কারণটি হলো দাসশিকারীরা নদী পথে আসলে দূর থেকেই তাদের আগমন বুঝা যেত এবং পাশে জঙ্গল থাকায় পালিয়ে আত্মরক্ষা করা সুবিধাজনক ছিল। এছাড়াও দাসব্যবসায়ীদের ভয়ে লোকজন সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় থাকতে ভয় পেত কারণ সেখানে থাকলে ধরা পড়ার ও বন্দি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বেশি।

আফ্রিকার আদিবাসী গোত্রগুলো সাধারণত তাদের পুরাতন বসতি পরিত্যাগ করতে চাইত না; বিশেষত শীতকালে বসতি ত্যাগ করতে একবারেই চাইত না। কারণ তারা যেখানে বাস করে, সেখানে ছিল জলের সহজলভ্যতা ও পারিবারিক কবরস্থান। পুরাতন বসতি ত্যাগ করার সময় সেখানে বলিদান বা উৎসর্গ করার প্রথা ছিল। দাসশিকারিদের আগমন বুঝার জন্য আফ্রিকার গ্রামগুলোতে পাহারার ব্যবস্থা ছিল। দাসশিকারিদের ভয়ে ঘুমানোর সময় তারা হাতের কাছে অস্ত্র রাখত। বিপদের সময়ে বা ক্রান্তিকালে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা সম্পদকে সাধারণ সম্পত্তি বলে মেনে নেওয়ার রীতি ছিল। সবাই গোত্রের প্রয়োজনে যৌথভাবে কাজ করত। সমালোচকের মতে, "আফ্রিকার মানুষেরা সরল, তারা সহজে বিশ্বাস করে, তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথ্যঐতিহ্যের বিধিনিষেধ" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ২২৫)।

কোনো কারণে আফ্রিকানরা পুরাতন বাসস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হলে, নতুন বাসস্থানে যাওয়ার আগে খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করত। নতুন বাসস্থান সন্ধানের জন্য তারা লোক পাঠাত। যে জায়গায় তারা যাবে, সেই জায়গার ভৌগোলিক অবস্থানটা দেখত। নতুন জায়গা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তারা কিছু বিষয়কে বিবেচনায় রাখত। যেমন সেখান থেকে পার্শ্ববর্তী এলাকাটা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় কিনা? পাশে পানির সহজলভ্যতা আছে কিনা? দাসব্যবসাকালীন আফ্রিকার গ্রামগুলোতে রাতের বেলা আগুন জ্বালানো নিষেধ ছিল। কারণ

এতে দাসশিকারিরা সহজেই অন্য মানুষদের অবস্থান নির্ণয় করে ফেলতে পারত। দাসশিকারিদের সহায়তা করত আড়কাঠিরা। আড়কাঠিরা হলো নিজেদের দেশের লোক। শ্বেতাঙ্গদের হয়ে দাস ধরার কাজ করে বলে তারা দালাল হিসেবে অভিহিত।

আফ্রিকার গোত্রভিত্তিক সমাজগুলো প্রধানত পুরুষতান্ত্রিক তবে কিছু কিছু মাতৃতান্ত্রিক পরিবারও রয়েছে। আফ্রিকার উপনিবেশিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ চরিত্রের মাত্রা দ্বিবিধ; এক দিকে তারা পুরুষ অপরদিকে তারা ঔপনিবেশিক শাসক। অপরদিকে ঐ সমাজে নারীকে শৈশব থেকেই শেখানো হয় যে, স্নেহ-মায়া-মমতা-ক্ষমা– এই অনুভূতিগুলো কেবল তাদের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে এবং নিরাপত্তার জন্যই তাকে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। সেই পুরুষ হতে পারে তার স্বামী, পিতা কিংবা পুত্র যে কেউ। এই সমাজে নারী জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের নিয়ন্ত্রক ও রক্ষাকর্তা একজন পুরুষ। এর প্রমাণ আমরা পাই, সিন্দিওয়ে মাগোনা রচিত 'ওইসব নিয়ে এখন কথা হচ্ছে না' গল্পে। সেখানে আমরা দেখি, আকস্মিক উত্তেজনার বশে ম্যামভালাইনের স্বামীর হাতে পুত্রের মৃত্যু ঘটে। বেঁচে থাকার জন্য তার কাছে স্বামী ও পুত্র দু'জনেরই প্রয়োজন ছিল। ছেলেকে হত্যার অপরাধে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় তার স্বামী ল্যাংগাথিকে। ছেলের শেষকৃত্যের সময় ল্যাংগাথি পুলিশের কাছে প্যারোলের অনুমতিও চায়নি, আসেওনি। কিন্তু কি কারণে ল্যাংগাথি অনুমতি চায়নি বা আসেনি সেই প্রশ্ন ম্যামভালাইন স্বামীকে করতে পারে না। লেখিকার ভাষায়–

> সে বলেছিল– 'আমি চাইনি'। ঠিক কী জিনিস যে সে চায়নি ম্যামভালেইন তা জিজ্ঞেস করতে পারেনি। কারণ যে উত্তর আসবে তা হয়তো শয়তানের গুরুজের মতো তাকে আঘাত করতে থাকবে সারাটা জীবন। সে কি চায়নি যে নিজের ছেলের অন্ত্যেষ্টিতে সে থাক, না কি সে চায়নি অন্ত্যেষ্টিতে অংশগ্রহণের জন্য জেলখানার অনুমতি। ম্যামভালেইন বুঝতে পারেনি এর কোনটি। ম্যামভালেইন এ–ও বুঝতে পারেনি এর কোনটি তার জন্য কম কষ্টের (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৪১)।

তাই, আফ্রিকার সমাজে পুরুষের শত বঞ্চনাকে নারীরা শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করে। সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নারী পিঠে ছেলেকে নিয়ে মাঠে কায়িকশ্রম করে ছেলেকে মানুষ করে। কারণ পুরুষেরা হয় স্বামী, পিতা বা ছেলে। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই নারী এই বন্ধনকে অস্বীকার করতে পারে না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে বঞ্চিত করার জন্যই শৈশব থেকেই তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ত্যাগের মহিমা।

আফ্রিকার পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নিজেদের সুবিধার্থে সমাজে নারীদের স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যে নারী সুগৃহিণী সে কেবল ঘরের কাজ করে। মেয়েলি কাজের মধ্যেই তার জীবন সীমাবদ্ধ। মেয়েলি কাজ মানে সাংসারিক কাজ। রান্না করা, কাপড় কাঁচা, ছেলে মেয়ে মানুষ করা ইত্যাদি খুঁটিনাটি কিন্তু অন্তহীন কাজ। এই সব সামান্য কাজ পুরুষালি কাজের মধ্যে পড়ে না। আবার যে সব নারী রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে তারা সংসার সামলাতে পারে না তাই তারা সাংসারিক কাজকর্ম করে না। অর্থাৎ আফ্রিকার সমাজে নারী হয় ঘরোয়া, শান্ত, সাধারণ, মূক নয়তো সে আধুনিকা কিংবা বিপ্লবিনী।

আফ্রিকার সমাজে নারীকে বিবেচনা করা হয় 'জন্মদুর্বল' ও 'স্বভাবদুর্বল' হিসেবে। যেসব নারীরা সমাজ স্বীকৃত সীমারেখার বাইরে অর্থাৎ সংসারের অন্দর থেকে বেরিয়ে বহির্জগতের

কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে তারা 'আধুনিকা' নামে পরিচিত হয়। এসব মেয়েরা চুল ছাঁটে, বিদেশি পোশাক পরে। অর্থাৎ আফ্রিকার সমাজের মেয়েরা কর্মপটিয়সী সুগৃহিণী হয় অথবা ছাঁটা চুলের আধুনিকা হয়।

আফ্রিকার গল্পগুলোতে আমরা যেসব খাদ্যদ্রব্য ও রান্নার সামগ্রীর উল্লেখ পাই, তার মধ্যে রয়েছে গোল আলু, পেঁয়াজ, ডাল, নুন, মাছ, গোশত, সবজি, চা, সুগার, যব, গুঁড়োদুধ, প্যাফিন, সসেজ, রুটি। তারা সবজি ঘন্ট করে। তাদের উৎপাদিত খাদ্যশস্য ছিল ক্যাসাভা, তালের তেল (পামওয়েল), মাখন, শিম, মধু।

আফ্রিকার সমাজে জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে নৌকা নিয়ে নদীতে মাছ ধরার প্রচলন ছিল। কেনিয়ার স্বাধীনতাপূর্বকালের সমাজে উল্টাভাবে সাইকেল চালিয়ে অন্যদের আনন্দদানের প্রচলন ছিল। ঐ সমাজে মেয়েরা বিপদের সময় বুকের মধ্যে পয়সা লুকিয়ে রাখত। পাখির মাংস খাওয়ার প্রচলন ছিল। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হলে স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে স্বামীগৃহ ত্যাগ করে বাপেরবাড়ি যেত। পিতা-পুত্রের মধ্যে মনোমালিন্য হলে সম্পর্কচ্ছেদের ঘটনাও ঘটত তবে পিতা পুত্রকে ভুলে যেত না।

সময় সম্পর্কে আফ্রিকার গোত্রভিত্তিক সমাজগুলোর ধারণা বেশ স্বতন্ত্র। বেলজিয়ান ঐতিহাসিক এবং আফ্রিকা গবেষক জান ভানসিনার মতে, "মৌখিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে দেখা যাবে আফ্রিকানরা সময়কে ভাবেন অতীতেরই চক্রাকারে ঘূর্ণন হিসেবে, বর্তমান তারই অঙ্গবিশেষ এবং সেখানে ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই" (উদ্ধৃত, শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৪৮)। 'উপজাতির ক্ষতচিহ্ন অথবা ভোলতেইকরা' গল্পে আমরা এই সময় ধারণার পরিচয় পাই। আমুদের গ্রামে দাসশিকারিদের আগমনের সময় নির্দেশ করতে গিয়ে গল্পকার বলেছেন, "তিনগুণ তিন অমাবস্যা আগে দাস শিকারিরা আমুদের গ্রামে হামলা করেছিল" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩০৯)। আর আমুদের গ্রামের এক মুরব্বি নিজেদের অনিরাপত্তার কথা বলেছে এভাবে– "পাঁচ'ছ বর্ষা আগে আমরা ভেবেছিলাম এখানে বেশ নিরাপদ আছি। কিন্তু এখন আর মোটেই নিরাপদ নই। গ্রাম থেকে মাত্র সাড়ে তিন দিনের পথ দূরে একটা দাস শিবির আছে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩১৩)।

পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে যখন ইউরোপের সাথে আফ্রিকার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আফ্রিকার সমাজগুলো ছিল গোত্রভিত্তিক এবং সামন্ততান্ত্রিক। তখনও আফ্রিকার সমাজে ব্যক্তিমালিকানা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং সমাজ ছিল মোটামুটি স্বনির্ভর; এক কথায় পুঁজিবাদবিরোধী। তখন গোত্রপতির নামেই বরাদ্দ ছিল সমস্ত ভূ-সম্পত্তি এবং প্রাকৃতিক সম্পদে ছিল গোত্রের সবার সমানাধিকার। গোত্র পরিচালিত হতো দৃঢ় সমষ্টিজ্ঞান, দায়িত্ববোধ এবং অলিখিত নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা।

আফ্রিকার গল্পগুলো আফ্রিকার জীবন ও সমাজের দর্পণ। আফ্রিকার গল্পকারেরা গল্পগুলোতে আফ্রিকার জনগোষ্ঠীর রীতি, আচার, উৎসব, প্রবাদ, লোককথার পর্যাপ্ত ব্যবহার করেন ফলে, "পাঠকের চৈতন্যে আফ্রিকী বাস্তবতা চিত্রিত হয়ে যায়" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ২০৬)।

দশ

আফ্রিকার গল্পগুলোয় কেবল ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ, অত্যাচার, বঞ্চনা ও বঞ্চনার উপলব্ধির রূপায়ণই ঘটেনি অধিকন্তু গল্পগুলোতে রূপায়িত হয়েছে বঞ্চনার অবসান প্রকাশক এক অপরিমেয় আশাবাদের ও সোনালি সুদিনের আগমনের প্রত্যাশার, য়ার ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে একটি সুন্দরজীবন, স্বাধীনদেশ ও খাদ্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা। 'অন্য পশু কেন খোদা করো না' গল্পটিতে আমরা দেখেছি এক চিত্রকরকে, যে কোনোদিন জলপ্রপাত দেখেনি অথচ সে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের ছবি এঁকেছে পত্র-পত্রিকায় দেখা জলপ্রপাতের ছবির স্মৃতির ওপর ভিত্তি করে। সে কখনো জলপ্রপাত দেখেনি ফলে সে জানে না জলপ্রপাতের জলের রং কেমন। সে কোথায় যেন শুনেছিল মানচিত্রে সমুদের জলের রং নীল দেখানো হয়েছে। সে মনে মনে ভাবে জলপ্রপাতের পানি তো সমুদ্রের পানির মতোই এবং আকাশের রঙের মতো দেখায়, তাই জলপ্রপাতের পানির রং হবে নীল। এছাড়াও সে ভাবে ছবিতে আবেগ সঞ্চার করতে হলে জলের রং অবশ্যই হতে হবে নীল। এভাবেই সে জলপ্রপাতের ছবি আঁকে আর ছবিটাকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য ছবির এক কোনায় প্রেমিক-প্রেমিকাকে নিয়ে আসে। গল্পকারের ভাষায়–

> চিত্রকর কল্পনায় তার ছবির এক কোনায় দু'জন প্রেমিক-প্রেমিকাকে নিয়ে আসে। তারা পরস্পরকে এমনভাবে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে যেন তাদের প্রেম নীল জলে স্থির হয়ে আছে। ছবিটার সবচেয়ে উপরে রয়েছে একটি পাখি যে গান গাইছে। তার ঠোঁট দুটো খোলা। জলপ্রপাত থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা প্রেমিক প্রেমিকার ওপর আসতে পারে তাই সে তাদের ওপরে একটা লাল রঙের ছাতা এঁকে দেয়। কিন্তু তার মনে হয় ছবি থেকে কিছু যেন বাদ পড়েছে তাই সে প্রেমিক যুগলের হাতগুলো লম্বা করে তাতে ধরিয়ে দেয় হলুদ আইসক্রিম। ছবিটি এখন জীবনে পরিপূর্ণ (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩২)।

শত প্রতিকূল অবস্থার পরেও তাঁদের মনে একটি নির্মল, সুন্দর, সৃষ্টিশীল সত্তা ক্রিয়াশীল ছিল। 'উপজাতির ক্ষতচিহ্ন অথবা ভোলতেইকরা' গল্পে আমরা দেখেছি বিপদের সম্ভাবনার মধ্যে থেকেও আমুর মনের সৃজনশীল সত্তা সক্রিয় রয়েছে। সে "একটা কাঠের টুকরো কেটে কেটে একটা পুতুল বানাচ্ছিল" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩১১)।

এগারো

আফ্রিকার গল্পগুলো আফ্রিকী জীবন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ, সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও প্রকাশক। আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলো যথা- ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ, অত্যাচার, বঞ্চনা, দাসব্যবসা, বর্ণবাদ ও শ্রেণিবিভক্ত সমাজ এবং এগুলোর পাশাপাশি আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের জীবনের সার্বিক চিত্র গল্পগুলোতে নিপুণভাবে উৎকীর্ণ। গল্পগুলো আফ্রিকার বিভিন্নদেশের সাহিত্যিকদের দ্বারা রচিত হলেও গল্পগুলোতে একদিকে যেমন মহৎ শিল্পের লক্ষণগুলো পরিদৃশ্যমান তেমনি অপরদিকে বিপন্ন ও কলুষিত অতীত ইতিহাসকে ধারণ করেও সোনালি সুদিনের আগমনের প্রত্যাশায় প্রোজ্জ্বল এবং সেখানে নবযুগ সৃষ্টির পূর্ণ প্রতিশ্রুতিও বিদ্যমান। শত শোষণ, শাসন, অত্যাচার, বঞ্চনা ও বিপন্নতার ভিতরে অবস্থান করেও গল্পকারগণ তাঁদের সাহিত্যে বৈরাগ্য, বিতৃষ্ণা, হতাশা কিংবা বিকারের চিত্র

অঙ্কন করেননি বরং মানুষ ও জীবনের প্রতি অবিচল বিশ্বাসকে সমুন্নত রেখে সোনালি সুদিনের ও মঙ্গলময়তার কথাই বারবার বলেছেন। আফ্রিকার গল্পগুলো সমকালের হয়েও সর্বকালের।

আকর গ্রন্থ

ক. শিবনারায়ণ রায় ও শামীম রেজা *সম্পা.* (২০০২)। *আফ্রিকার সাহিত্য সংগ্রহ–১*। কাগজ প্রকাশন, ঢাকা।

খ. শিবনারায়ণ রায় ও শামীম রেজা *সম্পা.* (২০০৪)। *আফ্রিকার সাহিত্য সংগ্রহ–২*। কাগজ প্রকাশন, ঢাকা।

টীকা

১. 'একমুঠো খেজুর' গল্পটি তায়েব সালেহ রচিত '*A Handful of Dates*' গল্পের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন মুহম্মদ মুহসিন।

২. 'আধুনিক আরবি উপন্যাসের অন্যতম প্রতিভা' কৃষাঙ্গ লেখক তায়েব সালিহ'র (Tayeb Salih, 1929-2009) জন্ম সুদানের উত্তর প্রদেশের নীল নদের তীরবর্তী শহর আল ডাব্বা'য় (Al Dabbah)। তিনি সুদানের একজন প্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক। তিনি খার্তুমের গর্ডন কলেজ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং শিক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল কৃষি সংশ্লিষ্ট পেশায় নিযুক্ত হবেন কিন্তু উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ইংল্যান্ডে চলে যান। তিনি ইউনেস্কোর হয়ে প্যারিসে, বিবিসি আরবি বিভাগে ও কাতারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের ডাইরেক্টর জেনারেল হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেন। তাঁর গ্রন্থগুলো হলো : Doumat wad Hamid (১৯৬০); Urs al-Zayn (The Wedding of Zein, 1964); *A Handful of Dates* (1964); *Mawsim al-Hijra ila al-Shamal* (Season of Migration to the North, 1967); *Daw al-Bayt* (Bandarshah I, 1971); *Maryud* (Bandarshah II, 1976)। দামেস্ক ভিত্তিক আরব লিটারারি অ্যাকাডেমি ২০০১ সালে তাঁর *Season of Migration to the North* উপন্যাসটিকে 'বিশ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরবি উপন্যাস' হিসেবে স্বীকৃতিদান করে। তাঁর রচিত গ্রন্থ ২০টিরও অধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। পূর্ব-পশ্চিমের সংস্কৃতির সংঘর্ষ, বাস্তবতা ও বিভ্রম, ভ্রাতৃত্বের ঐক্য ও দ্বন্দ্ব এবং এসব অসঙ্গতির মধ্যে সংমিশ্রণ খুঁজে পাওয়ার জন্য ব্যক্তির যে দায়িত্ব তা তাঁর লেখার বিষয়বস্তুতে ও অঙ্কিত চরিত্রে স্পষ্ট। তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় বিদেশে অতিবাহিত করেছেন কিন্তু তাঁর অধিকাংশ লেখার পটভূমি গড়ে উঠেছে ইসলামিক আবহমণ্ডিত গ্রামীণজীবন ও উত্তর সুদানের জনগণের জটিল সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে; যে জীবনকে তিনি শৈশব ও কৈশোরে অতিবাহিত করেছিলেন।

৩. কৃষ্ণাঙ্গ লেখক নগুগি ওয়া থিয়ঙ্গ (Ngũgĩ wa Thiong'o) আফ্রিকার অন্যতম ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক ও শিশুসাহিত্যিক। তাঁর জন্ম কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবি'র নিকটবর্তী Kamiriithu-তে ১৯৩৮ সালের ৫ই জানুয়ারি গিকুয়ু গোত্রে। খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার পর তাঁর নাম রাখা হয় জেমস্ নগুগি। স্থানীয় বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষে তিনি উগান্ডায় চলে যান এবং সেখানকার Makerere University College থেকে ১৯৬৩ সালে ইংরেজিতে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকা অবস্থায় তিনি ১৯৬২ সালে সেখানে অনুষ্ঠিত আফ্রিকান সাহিত্যিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি চিনুয়া আচেবে'-কে তাঁর লেখা *The River Between Ges Weep Not, Child* উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করতে দেন। এর কয়েক বছর পরই ১৯৬৪ সালে লন্ডন থেকে বইটি প্রকাশিত হয়। চিনুয়া আচেবে ছিলেন বইটির সম্পাদনা পরিষদের উপদেষ্টা। বইটি ছিল লন্ডন থেকে ইংরেজিতে প্রকাশিত প্রথম কোনো পূর্ব আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ লেখকের বই। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলো হলো : *Weep Not, Child* (১৯৬৪); *The River Between* (১৯৬৫); *A Grain of Wheat,* (১৯৬৭); *Petals of Blood* (১৯৭৭); *Caitaani*

mutharaba-Ini (*Devil on the Cross*, 1980); *Matigari ma Njiruungi* (১৯৮৬); *Mũrogi wa Kagogo* (*Wizard of the Crow*, 2004)। তাঁর গল্পগ্রন্থ দুটির নাম হলো : *A Meeting in the Dark* (১৯৭৪); *Secret Lives, and Other Stories* (১৯৭৬)। তিনি প্রথমে ইংরেজি ভাষায় লেখালেখি শুরু করলেও পরবর্তীকালে বুঝতে পারেন যে, এগুলো আসলে ঔপনিবেশিক মানসিকতার ছাপ। তাই ১৯৬৭ সাল থেকে তিনি জেমস্ নগুগি নাম পরিবর্তন করে বর্তমান নাম রাখেন এবং নিজস্ব Gikuyu ও Swahili ভাষায় লেখা শুরু করেন। গিকুয়ু ভাষায় প্রকাশিত *Mũtĩiri* নামক জার্নালের তিনি সম্পাদক। তিনি কেনিয়ায় বেশ কয়েক বছর কারাভোগ করেন। অতঃপর কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন এবং ১৯৮৯-১৯৯২ সাল পর্যন্ত ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান করেন। ১৯৯২ সালে তিনি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে Comparative Literature এবং Performance Studies বিষয়ে অধ্যাপনা করেন এবং 'এনরিখ মারিয়া রেমার্ক চেয়ার' হিসেবে মনোনীত হন। বর্তমানে তিনি Distinguished Professor of English and Comparative Literature এবং Director of the International Center for Writing and Translation হিসেবে University of California (Irvine)-এ কর্মরত আছেন। তিনি বেশ কয়েকবার নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন। তাঁর লেখার বিষয়বস্তু অনেকাংশে রাজনৈতিক এবং উত্তর ঔপনিবেশিক। তাঁর লেখার বিষয়বস্তু ও ভাষা সম্পর্কে *Publishers Weekly* মন্তব্য করেছিল : "Ngugi's language is fresh; the questions he raises are profound, the argument he makes is clear: 'To starve or kill a language is to starve and kill a people's memory bank।"

৪. 'ক্রুশ সকাশে বিবাহ' গল্পটি নগুগি ওয়া থিয়ঙ্গ রচিত 'Wedding at the Cross' গল্পের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন ধ্রুব গুপ্ত।

৫. কৃষ্ণাঙ্গ লেখিকা ভেরোনিক তাজো'র (Véronique Tadjo, 1955-) জন্ম ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। তিনি বড় হয়ে ওঠেন আইভরিকোস্টের রাজধানী আবিষদজানে। সেখানে স্কুল জীবন শেষ করে তিনি ভর্তি হন আবিদজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে। পরবর্তীকালে ফ্রান্সের সরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি 'আফ্রিকার সাহিত্য ও সভ্যতা' বিষয়ে পিএইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ শতকের আশির দশকের প্রথম দিকে তিনি আবিদজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং নব্বইয়ের দশকে স্বামীর সঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবি'তে। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শুরু কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে। ১৯৮৪ সালে *Latérite* নামে একটি কবিতা সংকলন বের হয়। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ হলো : *A vol d'oiseau* (১৯৮৬), *A mi-chemin* (২০০০)। তাঁর উপন্যাসগুলো হলো : *Le Royaume aveugle* (*The Blind Kingdom*, 1991); *Champs de bataille et d'amour* (১৯৯৯); *L'ombre d'Imana: Voyages jusqu'au bout du Rwanda* (*The Shadow of Imana: Travels in the Heart of Rwanda*, 2000); *Reine Pokou* (*Queen Pokou*, 2005); *Loin de mon père* (*Far from My Father*, 2010)। তাঁর রচিত '*Mamy Wata et le Monstre*' গ্রন্থটি বিশ শতকে আফ্রিকায় রচিত শ্রেষ্ঠ ১০০টি বইয়ের মধ্যে স্থান লাভ করে। তিনি ইউনিসেফ পুরস্কারসহ বেশ কয়েকটি পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ২০০৭ সাল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গে অবস্থিত University of the Witwatersrand-এ 'ফ্রেন্স স্ট্যাডিজ' বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন।

৬. 'এক জাদুকর ও এক তরুণীর গল্প'টি অনুবাদ করেছেন আহমেদ শামীম।

৭. উপনিবেশ পরবর্তী আফ্রিকার সাহিত্যিকদের মধ্যে পাঠকদের কাছে ব্যাপকভাবে পঠিত ও সমাদৃত কৃষ্ণাঙ্গ লেখিকা ইভোন্নি ভেরা'র (Yvonne Vera, 1964-2005) জন্ম জিম্বাবুয়ের বুলাওয়েতে। স্থানীয় বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে তিনি ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি (টরেন্টো, কানাডা) থেকে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচ. ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনে তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। তাঁর গল্প সংকলনের নাম *Why Don't You Carve Other Animals* (১৯৯২)। তিনি ১৯৯৭ সালে বুলাওয়েতে অবস্থিত National Gallery of Zimbabwe-র পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ২০০৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হলো *Nehanda* (1993), *Without a Name* (1994), *Under the Tongue* (1996), *Butterfly Burning* (1998), *The Stone Virgins* (২০০২)। এর পাশাপাশি তিনি

আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের নারীদের লেখা নিয়ে কয়েকটি সংকলনও সম্পাদনা করেছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম একটি হলো '*Opening Spaces : an Anthology of Contemporary African Women's* Writing' (১৯৯৯)। তাঁর লেখা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে জিম্বাবুয়ে ও কানাডাতে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখালেখির বিষয়বস্তু জিম্বাবুয়ের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কঠিন অতীতের খুন, ধর্ষণ, নিষ্ঠুরতা, শিশুহত্যা ও লিঙ্গবৈষম্য। তাঁর কাহিনির নির্বাসিত আত্মারা ইতিহাস ও তাৎক্ষণিকতার ভেতরে পাঠককে যোগাযোগ খুঁজতে প্ররোচিত করে। তাঁর গল্পের নারী চরিত্রগুলো বেশ বলিষ্ঠ। তাঁর গদ্য প্রগাঢ়, গীতিধর্মী ও কাব্যময়। নিজের জাতিকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। শব্দ ব্যবহারে তাঁর কোনো ভীতি ছিল না। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "I would love to be remembered as a writer who had no fear for words and who had an intense love for her nation."

৮. 'অন্য পশু কেন খোদাই করো না' গল্পটি ইভোন্নি ভেরা রচিত '*Why Don't You Carve Other Animals*' গল্পের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন মোস্তফা মীর।

৯. নাডিন গার্ডিমার (Nadine Gordimer, 1923–2014) দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক কর্মী। তাঁর জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গের অদূরে East Rand mining শহরের অন্তর্গত Springs, Gauteng নামক স্থানে। তিনি স্থানীয় ক্যাথোলিক কনভেন্ট স্কুলে অধ্যয়ন করেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস *The Lying Days* প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে। তাঁর লেখালেখির বিষয় দক্ষিণ আফ্রিকার নৈতিক ও জাতিগত সমস্যা, বিশেষত বর্ণবাদ। অল্প বয়স থেকেই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সাংবিধানিক বর্ণবৈষম্য ও জাতিগতবিভেদ সম্পর্কে অবগত ও সোচ্চার ছিলেন, কারণ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্বেতাঙ্গ পরিবারের লোক হলেও শৈশব থেকে তাঁর এসব ভালো লাগেনি। কালো মানুষদের ওপর শ্বেতাঙ্গ জনগণ এমনকি সরকার আরোপিত জাতিগত অর্থনৈতিক অসমতা, দারিদ্র্য, বৈষম্য প্রভৃতির চিত্র যেমন তাঁর লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে তেমনি রূপায়িত হয়েছে নির্বাসিত ও অভিবাসী কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের জীবন। তিনি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসে যোগ দিয়ে বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লেখার কারণে তাঁর দুটি উপন্যাস *Burger's Daughter* এবং *July's People* দক্ষিণ আফ্রিকায় নিষিদ্ধ হয়। তিনি মনে করতেন, দক্ষিণ আফ্রিকার উচিত তার দীর্ঘদিনের অনুসৃত বর্ণবাদ নীতিকে পুনর্নিরীক্ষা করা ও বদলে ফেলা। তিনি এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির পক্ষেও কাজ করেন। তিনি ১৯৯১ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১০. 'সাড়ে তিন হাত মাটি' গল্পটি নাডিন গার্ডিমার রচিত 'Six Feet of the Country' গল্পের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন দুলাল আল মনসুর।

১১. কৃষ্ণাঙ্গ সাহিত্যিক ফার্দিনান্দ ওইনো (Ferdinand Oyono)'র জন্ম আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলীয় দেশ ক্যামেরুনের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশের Ebolowa এর নিকটবর্তী N'Goulémakong-তে ১৯২৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। তাঁর মূল নাম Ferdinand Léopold Oyono। তিনি ছিলেন ক্যামেরুনের একজন কূটনৈতিক, রাজনৈতিক এবং উপনিবেশবিরোধী কথাসাহিত্যিক। তিনি ক্যামেরুনের রাজধানী ইয়াউন্ডে থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং আইন ও প্রশাসন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করার জন্য প্যারিসে যান। ক্যামেরুনের স্বাধীনতা লাভের পর তিনি প্রথম পর্যায়ে ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৮২-৮৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে ক্যামেরুনের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭৪-৮২ কালপর্বে জাতিসংঘে ক্যামেরুনের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ২০১০ সালের ১০ জুন মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন সময়ে ক্যামেরুন সরকারের গৃহায়ণ ও নগর পরিকল্পনা মন্ত্রী, বৈদেশিক সম্পর্ক তথা পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং সংস্কৃতি মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সাহিত্যকর্মের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হলো : *Une vie de boy* (*Houseboy*, ১৯৫৬); *Le Vieux Nègre et la médaille* (*The Old Man and the Medal,* 1956); *Chemin d'Europe* (*Road to Europe,* 1960)। তিনি প্রথমে ফরাসি ভাষায় লিখতেন। পরে সেগুলোকে ইংরেজিতে ভাষান্তর করা হয়েছিল। তাঁর লেখালেখি কলোনিয়াল ব্যঙ্গ ও উপহাসে ভরপুর এবং সেখানে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে মানুষকে অতি সহজে বোকা বানানো যায়।

১২. 'পদক' গল্পটি তাঁর ফার্দিনান্দ ওইনো রচিত '*The Old Man and the Medal*' গল্পের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন খলিকুজ্জামান ইলিয়াস।

১৩. পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সেনেগালের চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক ও লেখক সেমবেন ওসমান (Ousmane Sembène, 1923-2007) উপনিবেশ পরবর্তী আফ্রিকান সাহিত্যের অন্যতম সাহিত্যিক। তিনি 'আফ্রিকান চলচ্চিত্রের জনক' হিসেবে খ্যাত আর 'Los Angeles Times' এর মতে, তিনি 'আফ্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকদের একজন'। তিনি পশ্চিম আফ্রিকার সেয়ার (Serer) গোত্রের লোক। তাঁর জন্ম সেনেগালের দক্ষিণাঞ্চলীয় এলাকা Casamance-র Ziguinchor শহরে একটি কৃষ্ণাঙ্গ জেলে পরিবারে। তাঁর মাতৃভাষা উওলোফ (Wolof) কিন্তু তিনি ফ্রেন্স ও আরবি জানতেন। তিনি প্রথমে কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও উপন্যাস রচনার মাধ্যমে সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং সাহিত্যরচনাকেই জীবিকানির্বাহের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা *Liberté* (১৯৫৬)। তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাসের নাম '*Le Docker Noir*' (The Black Docker, 1956), '*O Pays, mon beau peuple!*' (Oh country, my beautiful people!, 1957), তাঁর রচিত বিখ্যাত উপন্যাস হলো '*Les Bouts de Bois de Dieu*' (God's Bits of Wood, 1960)। উপন্যাসটিকে তুলনা করা হয় Émile Zola'র 'Germinal' উপন্যাসের সাথে। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলো হলো : *Le dernier de l'empire* (The Last of the Empire, 1981), *Guelwaar* (১৯৯৬), *Le mandat, précédé de Vehi-Ciosane* (The Money-Order with White Genesis, 1966)। তাঁর ছোটগল্পের সংকলনের নাম '*Voltaïque*' (Tribal Scars)। সংকলনটি প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে আর ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে। তাঁর অন্যান্য গল্পগ্রন্থগুলো হলো : *L'Harmattan* (১৯৬৪), *Xala* (১৯৭৩), *Niiwam* (১৯৮৭)। তাঁর রচিত সাহিত্যকর্মে নারীরা একটি বড় ভূমিকা পালন করে। তাঁর রচনার একটি বড় বিষয় বর্ণবাদ। তাঁর প্রকাশিত দশটি সাহিত্যকর্মের সাতটিই ইংরেজিতে অনূদিত হয়। প্রথমে সাহিত্যরচনায় নিমগ্ন থাকলেও তিনি পরে বুঝতে পারেন যে, সাহিত্যের মাধ্যমে আফ্রিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরক্ষর সাধারণ লোকের কাছে তিনি পৌঁছাতে পারছেন না। তাঁর দৃষ্টিতে, তাদের কাছে পৌঁছানোর আরও সক্রিয় মাধ্যম হলো চলচ্চিত্র। তাই তিনি লেখালেখির জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। এ লক্ষ্যে তিনি ১৯৬২–৬৩ সাল পর্যন্ত মস্কোয় অবস্থান করেন এবং বিখ্যাত সোভিয়েত চলচ্চিত্র পরিচালক মার্ক ডস্কয় এর তত্ত্বাবধানে 'গোর্কি ফিল্ম স্টুডিও'তে চলচ্চিত্র নির্মাণ বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। তাঁর নির্মিত প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রের নাম 'Black Girl' (১৯৬৬)। চলচ্চিত্রটির জন্য তিনি সম্মাজনক 'Jean Vigo' পুরস্কার লাভ করেন।

১৪. উপজাতির ক্ষতচিহ্ন অথবা ভোলতেইকরা গল্পটি সেমবেন ওসমান রচিত 'Tribal scars or The Volaique' গল্পের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৫. কৃষ্ণাঙ্গ কবি, নাট্যকার, গল্পকথক, অভিনেত্রী, অনুবাদক ও প্রেরণাদানকারী বক্তা সিন্দিওয়ে ম্যাগোনা (Sindiwe Magona)'র জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সকিতে ১৯৪৩ সালের ২৭ আগস্ট। তিনি বেড়ে ওঠেন কেপটাউন শহর এলাকায় এবং সেখান থেকেই মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তিনি University of South Africa থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং Columbia University থেকে সাংগঠনিক সমাজকর্ম বিষয়ে এম.এসসি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি Hartwick College, Oneonta থেকে সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি প্রায় ২০ বছরেরও অধিক সময় জাতিসংঘে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করছেন এবং আবাসিক লেখক হিসেবে কাজ করছেন University of the Western Cape (দক্ষিণ আফ্রিকা) এবং Georgia State University (আটলান্ট, যুক্তরাষ্ট্র)-তে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদ প্রথার অবসানে তিনি ভূমিকা পালন করেন। তাঁর আত্মজৈবনিক রচনা হলো : *To My Children's Children* (১৯৯০); *Forced to Grow* (১৯৯২), গল্পগ্রন্থগুলো হলো : *Living, Loving and Lying Awake at Night* (১৯৯১); *Push-Push and other stories* (১৯৯৬), উপন্যাসগুলো হলো : *The Best Meal Ever!* (১৯৯৮); *Beauty's Gift* (২০০৮), শিশুতোষগ্রন্থগুলো হলো : *Die heel, héél lekkerste kos!* (২০০৬); *Esona-sona sidlo!* (২০০৬); *The Best Meal Ever*! (২০০৬)। তিনি লিখেছেন প্রথমে ইংরেজিতে পরবর্তীকালে সেগুলো অনূদিত হয়েছে নিজস্ব ঝোসা (Xosa) সহ অন্যান্য ভাষায়।

১৬. 'ওইসব নিয়ে এখন কথা হচ্ছে না' গল্পটি সিন্দিওয়ে ম্যাগোনা রচিত "I'm Not Talking About That, Now" গল্পের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন মুহম্মদ মুহসিন।

১৭. কৃষ্ণাঙ্গ ঔপন্যাসিক, কবি, সমালোচক ও শিক্ষক চিনুয়া আচেবে (Chinua Achebe, 1930–2013)-র জন্ম পূর্ব নাইজেরিয়ার Ogidi-র অন্তর্গত ইগবো শহরে ১৬ নভেম্বর ১৯৩০ সালে। তাঁর মূল নাম Albert Chinụalụmọgụ Achebe। তাঁকে 'আধুনিক আফ্রিকান সাহিত্যের জনক' হিসেবে অভিহিত করা হয়। তিনি ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি গল্প লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস *Things Fall Apart* প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। উপন্যাসটিকে বিবেচনা করা হয় আধুনিক আফ্রিকান সাহিত্যের সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ হিসেবে। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলো হলো : *No Longer at Ease* (১৯৬০); *Arrow of God* (১৯৬৪); *A Man of the People* (১৯৬৬); *Anthills of the Savannah* (১৯৮৭)। তাঁর ছোটগল্পগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : *Marriage Is A Private Affair* (১৯৫২); *Dead Men's Path* (১৯৫৩); *The Sacrificial Egg and Other Stories* (১৯৫৩); *Civil Peace* (১৯৭১); *Girls at War and Other Stories* (১৯৭৩); *The Voter*, *An Image of Africa: Racism in Conrad's* "Heart of Darkness" তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ। লেখালেখিতে তিনি ইগবো সমাজের বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকপাত করেছেন এবং দেখিয়েছেন উপনিবেশকালীন ও উপনিবেশ পরবর্তী ইগবো সমাজে খ্রিষ্টান ধর্মের প্রভাবকে এবং আফ্রিকার নিজস্ব মূল্যবোধের সাথে পশ্চিমা মূল্যবোধের দ্বন্দ্বকে। তাঁর উপস্থাপনরীতি হলো ইগবো সমাজের গল্প বলার মৌখিক রীতি, যার সাথে মিশে থাকে লোকগল্প, প্রবাদ-প্রবচন এবং সহজবোধ্য বিবরণ। তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি আফ্রিকান চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে আফ্রিকার নিজস্বরীতিতে আফ্রিকার গল্পগুলো বর্ণনা করেন। তিনি ১৯৯০–২০০৯ কালপর্বে যুক্তরাষ্ট্রের Bard College, David and Marianna Fisher University এবং Brown University-তে অধ্যাপনা করেন। তিনি ২০০৭ সালে Man Booker International Prize লাভ করেন।

১৮. পরিণয়ে নিজস্ব মত গল্পটি চিনুয়া আচেবে রচিত 'Marriage is a Private Affair' গল্পের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন দুলাল আল মনসুর।

সহায়কপঞ্জি

ফখরুল চৌধুরী (২০১১)। *উপনিবেশবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ*। আগামী, ঢাকা।

বিষ্ণু বসু *সম্পা.* (২০০৫)। *আফ্রিকার সাহিত্য সংকলন*। বৈশাখী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৬৭)। *রবীন্দ্র রচনাবলী–বিংশ খণ্ড*। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

শামসুজ্জামান খান (২০১১)। *আফ্রিকার কবিতা*। পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ (২০১২)। *আফ্রিকার কবিতা*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (২০০২)। *দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাস*। এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।